মহাযোগী সাধনানন্দ

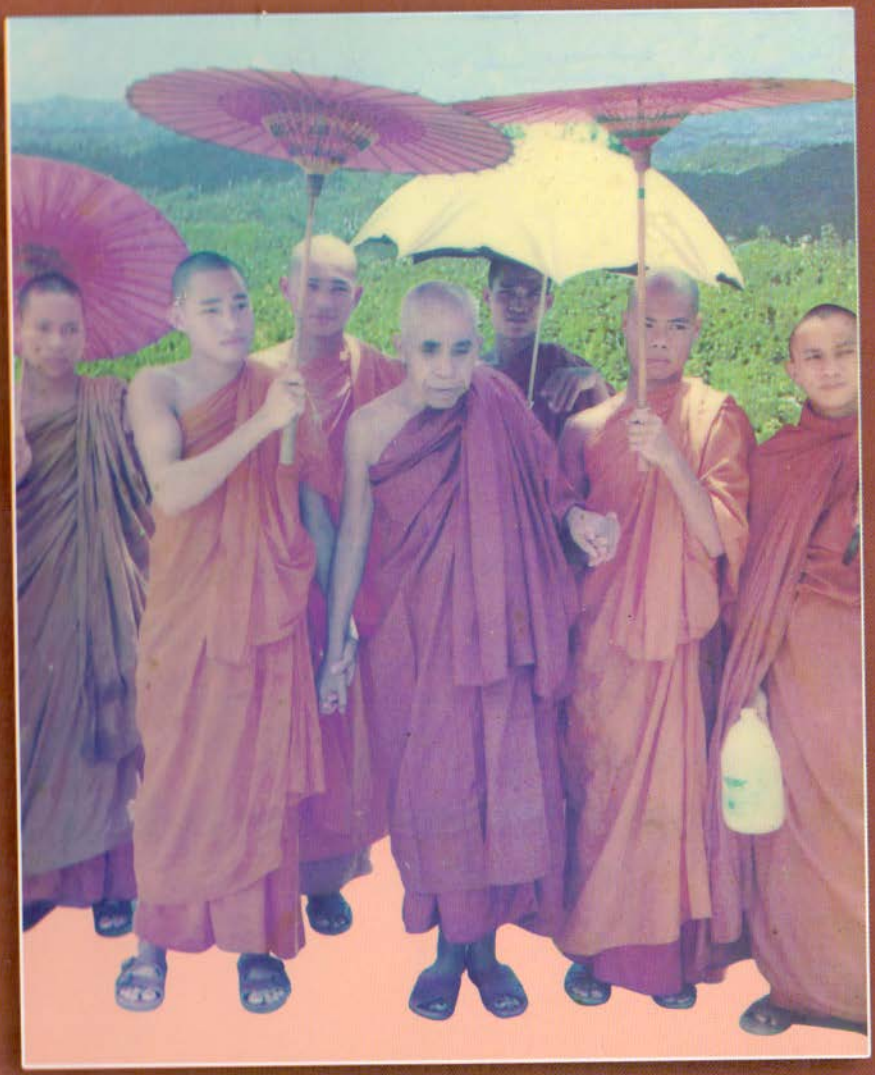

দীপক বড়ুয়া সৃজন

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

মহাযোগী সাধনানন্দ
(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

প্রকাশক
দেবাশীষ বড়ুয়া
২৮, ব্রিকফিল্ড রোড,
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল
প্রবারণা পূর্ণিমা
২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ
১৪১০ বাংলা, ২০০৩ ইংরেজী

মুদ্রণে
রাজবন কম্পিউটার
১৯, জি, এ, ভবন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জিনাংসু বড়ুয়া
৩২৭, রাজাপুর লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
উদয়ন বড়ুয়া
২৮, ব্রিকফিল্ড রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

বনভন্তের হিতোপদেশ

মানব জীবন দুঃখজনক

স্পৃশ্য অস্পৃশ্য আজ মানব সমাজ চিনিমিনি খেলায় ঢুকিয়া ঢুকিয়া মানুষ যখন দুঃখগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হয় তখন ভগবান বুদ্ধ বিশ্ববাসীর দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাদের এত দুঃখ কেন? এস, আমি তোমাদিগকে শান্তির সন্ধান দিতেছি। তোমরা কামনা বাসনা বিজয় করিয়া সত্য ধর্মের অনুসন্ধান কর। পরের বৃথা কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে নিজ কর্তব্য সম্পাদন কর। যাবতীয় জীবের প্রতি হিংসা ভাব পোষণ না করিয়া সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইবে না, ভোজনে সংযম রক্ষা কর। যাহারা ভোজনে সংযম রক্ষা করিবে তাহারা চারি আর্য সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।" সেই চারি আর্যসত্য কি? পঞ্চস্কন্ধ, দুঃখ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে তাহা জ্ঞাত হইতে হইবে। অবিদ্যা তৃষ্ণা সমুদয় আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে পরিহার করিবে। নির্বাণ যে নিরোধ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। শমথ ও বিদর্শন মার্গ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞান গঠন করিতে হইবে। এই চারি আর্যসত্যকে জানিতে বুঝিতে পারিলে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব কোন দেশের বা কোন জাতির জন্য হয় নাই। সমগ্র পৃথিবীর জীব মণ্ডলীর দুঃখ মোচনের জন্য বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। স্বীয় আদর্শ জীবন দ্বারা বুদ্ধের অহিংসা বাণী যাঁহারা প্রচার করিবেন তাঁহারাও পৃথিবীর অপেক্ষা রত্ন বলিয়া খ্যাত হন। প্রাণী মাত্রই সুখ বিলাসী। যে আত্ম বিলাসী না হইয়া সুখাকাঙ্খী জীবনকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করেন না পরকালে নিশ্চয় সুখলাভ করিবেন।

বুদ্ধ ধর্ম পদে বলিয়াছেন– "হীন বিষয় সেবা করিবেন না, প্রমত্ততায় জীবন কাটাইবেন না, মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিবেন না। লোক জন্মান্তরে

সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন না।" সিদ্ধার্থ গৃহীকালে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কি পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষ যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

এই সম্বন্ধে তিনি জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইলেন। রাজার পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইয়াও জগতের মঙ্গলার্থে জ্ঞানের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া দুইটি বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন যে সর্বজ্ঞতা ও কুশল জিনিসটা কি? অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধানী ছিলেন না। ছয় বৎসর পর্যন্ত মরার মত কঠোর তপস্যা করিয়া বলিয়াছেন যে দুঃখমুক্তির জন্য কাম ভোগ যেমন অনর্থক তেমনি কৃচ্ছসাধনও নিস্ফল। অর্থাৎ এই নির্বাণ যাইতে হইলে কোনদিকে বাড়াবাড়ি চলিবে না, ঠিক মধ্যম প্রতিপদ অবলম্বন, উপবাস জনিত শরীরে নানারূপ কষ্ট দেওয়া তাহাও অন্যায়। সেই মধ্যম পথ কি? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। কামসুখ ও আত্মপীড়ন এই দুই অনন্ত অনুশীলন না করিয়া এই মধ্যম পথ দিয়া নির্বাণ যাইতে হয়। সেই মধ্যম পথ হইল সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই দুঃখ মুক্তির নির্বাণ লাভের যথার্থ পথ। এই মার্গ ভাবনা করিয়া নির্বাণ যাইতে হয়।

রাজবন বিহার, **সাধনানন্দ মহাস্থবির**
রাঙ্গামাটি।

নিবেদন

যে সব যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাদেরকে জানা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জীবন সমুদ্রের মত অন্তহীন। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়ালে যে অংশটুকু আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র, বৃহত্তর অংশ আমাদের দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত থেকে যায়।

সেইরূপ মহান সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের জীবন সম্বন্ধে যাহা আমাদের কাছে স্পষ্ট তাহা স্বল্পই; বৃহত্তর ভাগ আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। একজন মহাযোগীকে জানতে হলে দ্বিতীয় মহাযোগীর আবির্ভাব প্রয়োজন। আমরা শুধু স্থূলভাবে জেনেছি তিনি মহান সাধক একজন পুণ্যপুরুষ। এই পরিচয়ে তৃপ্ত। তারপরও আমার অক্ষমতা নিয়ে এ মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করি। এই আলোচনার মধ্যে আমরা তাঁর যে খন্ড পরিচয় খুঁজে পাই, তাহা আমাদের মনকে মহান ভাবে অনুপ্রাণিত করে। বনভন্তের জীবন আমাদের কাছে একাধারে শান্তি ও আনন্দের পরিবেশক। তাঁর সমগ্র জীবন যে গভীর প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ বিপুল আনন্দে আপ্লুত এবং উদার আধ্যাত্মিক আলোকে সমুজ্জ্বল, তাহা প্রাণবান পাঠকের দৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করবে।

সমগ্র বিশ্বের মানুষ আজ আরণ্যক জিঘাংসায় আচ্ছন্ন। মানুষের রক্তে রাঙানো ঘাতকের উদ্যত তরবারি। যেন চারদিকে চলছে জীবন হরনের প্রেতনৃত্য। আনবিক অস্ত্রের মহড়া, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, মানুষে মানুষে হানাহানি, যুদ্ধের দামামা, বাতাসে বারুদের বিষাক্ত গন্ধ যেন সভ্যতাকে উপহাস করছে। আজ মানবতার পরাজয়। আনবিক শক্তিতে বলীয়ান দেশ সমূহের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। আনবিক সমরাস্ত্রের ভয়াল ধ্বংসলীলা মানুষের শান্তির পৃথিবীতে জ্বেলে দিয়েছে অশান্তির লেলিহান শিখা। মানুষের মননে মেধায় এবং চিরন্তন বিশ্ব প্রেমের উৎস ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের দাবানল। সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে, মানুষের পৃথিবীকে বধ্যভূমি বানানোর জন্যে যারা আনবিক অস্ত্র তৈরী করে তারাও শান্তি চায়। বিশ্ব জুড়ে সকল অশান্তি, অসাম্য আর অসুন্দরের মাঝেও আজ আমরা একটু আনন্দে এবং গৌরবে উদ্বেলিত। সদ্ধর্মের পথিকৃত প্রাণপুরুষ সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের আবির্ভাব সমগ্র জগতে সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে আনন্দ জয়ধ্বনি। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় সত্ত্বগণের বিভিন্ন পরিণতি।

সাম্য সুন্দরের দীপ্ত বাসনায়, মানবতার হিরন্ময় শান্তির ললিত জয়গান ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিদিন রাজবন বিহার প্রাঙ্গনে। প্রতিদিন মিলিত হচ্ছে সর্বস্তরের জনতা, মনে প্রাণে মিলনে সৃজন করছে আনন্দ ধারা। এই তো সময়, আর বিলম্ব নয়, বনভন্তে দর্শনে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আমার এই খন্ড বনভন্তের জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশে যার স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুপ্রেরণায় আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে ফটিকছড়ির কোঠের পাড় নিবাসী সমাজ হিতৈষী উদার প্রাণ স্বধর্ম পরায়ন পরম স্নেহ ও প্রীতিভাজন শ্রীমান দেবাশীষ বড়ুয়া। তার ধর্মপ্রাণ পিতা বাবু সুনিল কান্তি বড়ুয়া ও বিদর্শন সাধিকা নিরুপমা বড়ুয়ার নামানুসারে প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করতে সমর্থ হলো সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের জীবন কাহিনী গ্রন্থটি। তার অকৃত্রিম পুণ্যচেতনা কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। তবুও এজন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই তার নিরাপদ দীর্ঘ জীবন তরঙ্গায়িত হউক মানব কল্যাণে, গৌরবের আসনে, সৃজনে আনন্দ ধারায়। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এ খন্ড জীবনী গ্রন্থটি যার অসাধারণ ধীশক্তির মাধ্যমে সুন্দর ও মার্জনীয় করে তুলেছেন তিনি হচ্ছেন বোয়ালখালী বৈদ্যপাড়া নিবাসী বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরস্থ রাজাপুর লেইনে অবস্থানরত আমার পরম হিতৈষী সদ্ধর্মপরায়ণ পিতাসম শ্রদ্ধাভাজন বাবু জিনাংসু বড়ুয়া মহোদয়। তিনি অতি যত্ন ও ধৈর্য সহকারে এই পান্ডুলিপির শ্রীবৃদ্ধি ও প্রুফ সংশোধন করে বনভন্তের জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশের পথ সুগম করে দিয়েছেন। সাধকপ্রবর শ্রীমৎ বনভন্তের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের কথা শুনে উনাইনপুরা নিবাসী শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর পীযুষ কান্তি চৌধুরী (প্রাক্তন পরিচালক বাংলাদেশ বার্ডস), রীতা বড়ুয়া চৌধুরী এবং তাঁর দ্বিতীয় কন্যা মিসেস অঞ্জনা চৌধুরী স্বামী বাবু অমূল্য ভূষণ বড়ুয়া (এডিশনাল এ. আই.জি) গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কিছু শ্রদ্ধাদান পাঠিয়েছেন তজ্জন্য আমি তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ বনভন্তের জীবনীর মূলকিছু উল্লেখযোগ্য পরিচয় মাত্র। এই মহাপুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনী পর্যায়ক্রমে প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প রয়েছে আমার।

– গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে একটি নাম, একটি প্রতিজ্ঞা ও একটি বিস্ময়। তাঁর আবির্ভাব অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে আলোর পথ দেখানোর জন্য। তিনি একজন প্রকৃত বুদ্ধ পুত্র। তাঁর জীবন ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রহেলিকাময়। তাঁর অনুপম আত্মত্যাগ, জীবন্ত সাধনা ও অপূর্ব কর্মধারা ম্রিয়মান বিপর্যস্ত বৌদ্ধ সমাজকে নবজীবন দান করে অগ্রসর করে দিয়েছেন। তাঁর জ্যোতির্ময় সাধনা প্রভাব আলোক-বর্তিকা জ্বেলে দিয়েছে আমাদের অন্তরে। আমি মনে করি এই মহাপুরুষের জীবনাদর্শ ও ধর্মনীতি অনুসরণ করা প্রত্যেকেরই একান্ত প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিঃসন্দেহে জাতিবাদ, গোত্রবাদ, যাবতীয় মতবাদ ও দলবাদের উর্ধ্বে সর্বজন বন্দিত, নন্দিত, লোকোত্তর ধর্মের অধিকারী একজন পরম কল্যাণমিত্র। তাঁকে জাতিবাদ বা দলবাদের সীমাবদ্ধ চিন্তাধারার আলোকে বিচার করার কোন অবকাশ নেই। তিনি চাক্‌মা সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে ঐ পরিচয়ে চিহ্নিত নহেন কিংবা সংঘরাজ নিকায়ে উপসম্পদা লাভ করেছেন বলে ঐ নিকায়ভুক্ত নহেন। তিনি একজন সংসার ত্যাগী লোকোত্তর ধর্মের অধিকারী মহিমান্বিত সৎপুরুষের পরিচয়ে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে আমার আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা বাবু সুনীল কান্তি বড়ুয়া ও মাতা শ্রীমতি নিরুপমা বড়ুয়ার নিরাময় ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করলাম। আমার এ প্রকাশনা শ্রদ্ধেয় ভন্তের উদ্দেশ্যে দান করলাম।

স্বীয় জীবনে উন্নতিকামী ও সদ্ধর্মানুরাগীদের এই পুস্তকের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণও উপকার হয় তাহলে আমার দান সার্থক মনে করব।

দেবাশীষ বড়ুয়া
২৮, ব্রিকফিল্ড রোড,
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

আর্যপুরুষ বনভন্তের পদধূলি নিতে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থের প্রকাশক,
সদ্ধর্মনুরাগী বাবু দেবাশীষ বড়ুয়া।

ভূমিকা

মহাসাগরে ঢিল ছোড়ার তুল্য হলেও আমার পরম স্নেহ প্রতিম বাবু দীপক বড়ুয়া সৃজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখার চেষ্টা করেছেন ইহা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ ও দুরূহ কাজ। আমি তার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছি। তার ভাবভঙ্গি খুবই সহজ, সরল ও সাবলীল।

আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে মহোদয় মহাজ্ঞানী ও মহাসাধক। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বুদ্ধ প্রশংসিত একজন ভিক্ষু। লেখক প্রবল ধর্মানুরাগ, গভীর মননশীলতা ও অনেক কষ্টের ফলে বনভন্তের জীবনের খুঁটিনাটি বহু বৃত্তান্ত, আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত করেছেন। তাছাড়া লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আরও লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। লেখক শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে বিশেষভাবে জেনেছেন ও বুঝেছেন। তাই শ্রদ্ধেয় ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে অগণিত ভক্তবৃন্দের কাছে আশ্চর্য ও চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

লেখক তার সংক্ষিপ্ত লিখনীতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের অলৌকিক বিষয়ের বহু ঘটনাবলী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভন্তের দেশনা বর্ণনায় দেখা যায় শ্রদ্ধেয় ভন্তে কারো প্রতি কোন কোন সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহার করলেও লোভ, দ্বেষ, তুচ্ছ বা তাচ্ছিল্য করে ব্যবহার করেননি। তা শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্যই বলেছেন, অমঙ্গলের জন্য নহে।

লেখকের লেখার মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় ভন্তের যে পরিচিতি, শ্রামণ ও প্রব্রজ্যা জীবনের ইতিহাস, কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরেছেন, তদ্দ্বারা ভিক্ষু, শ্রামণ, গৃহী ও অগণিত গুণগ্রাহীরা এই গ্রন্থপাঠে যথেষ্ট উপকৃত হবেন কোন সন্দেহ নেই। তবে আমি মনে করি যে, শ্রদ্ধেয় ভন্তের সম্বন্ধে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

লেখকের সাহিত্য কর্মের ভূবনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবনী এক মূল্যবান সংযোজন। এখানে লেখকের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সহজ, সরল কিন্তু ভাব গভীর। আসলে জীবনী রচনা সহজ কাজ নয়। লেখকের হাত কাঁচা হলেও লেখার উৎসাহ বোধ করেন। লেখা সংক্ষিপ্ত হলেও তার উপস্থাপনা চমৎকার।

লেখকের বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন শান্ত, স্নিগ্ধ বাক্‌খালী গ্রাম। লেখকের উচ্চ শিক্ষার দাবী না থাকলেও তার রচিত বিভিন্ন বইয়ের প্রমাণ মেলে যে একজন যুক্তিনিষ্ঠ। তার রচিত গ্রন্থে অগাধ যুক্তি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। আমার দৃষ্টিতে সে একজন ইতিহাসশ্রয়ী। হয়তো বা পূর্ণতা আসেনি। পূর্ণতা এলে আরো আনন্দিত হবো। ভক্তি বিনম্রচিত্তে আর্যপুরুষ বনভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ বাবু দেবাশীষ বড়ুয়ার অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হওয়াতে তার নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

রাজাপুর লেইন, চট্টগ্রাম **জিনাংসু বড়ুয়া**
০৯.১০.২০০৩

"কতলক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরনীর তলে ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী"

মানব সমাজ আজ যাকে নিয়ে ধন্য তিনি সেই সর্বগুণে গুণান্বিত সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে একটি নাম, একটি আলোক উজ্জ্বল প্রতিভা ও একটি বিস্ময়। পৃথিবীর মানুষ যখন হিংসায় উম্মত্ত হয়ে উঠে তখন মানবগণকে উদ্ধার করার জন্যে সৎ পথে পরিচালিত করার জন্যে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটে। সাধকপ্রবর বনভন্তের জন্মও এমনি এক চরম মুহূর্তে, তাঁর আবির্ভাব এ সময়ের শ্রেষ্ঠ উপহার। নামের সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের সঙ্গতি তাঁর জীবনে সত্যই বিস্ময়কর। তিনি সকল গুণের আধার অর্থাৎ সর্বগুণে বিভূষিত ব্যক্তি। এই মহাপুরুষের জন্ম সমগ্র বৌদ্ধ সমাজে সঞ্চার করেছে নব প্রাণ এবং প্রবর্তন করেছে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের নবযুগ। তাঁর জন্ম স্মরণ করিয়ে দেয় বুদ্ধ যুগের মহাজাগরণের কথা। দূর থেকেই দেখা যায় হিমালয় পর্বত। কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না। তেমনি দূর থেকে সকলে জানে পুণ্য পুরুষ বনভন্তের কথা, যাঁর নামে সবাই শ্রদ্ধায় নতশির। এ মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভে সকলে মনে করেন তাদের চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়েছে, ক্লেশ বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়েছে। তখন পুলক-শিহরণ জেগে উঠে তাদের অন্তরে। সাধক প্রবর শ্রীমৎ বনভন্তে এখন আমাদের কাছে পরম গুরু, অপ্রতিম কল্যাণমিত্র, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ, শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা বিধায়ক; অমৃতদায়ক, লোকোত্তর ধর্মের অদ্বিতীয় শিক্ষক, অগতি-নিবায়ক, নির্বাণমার্গে পরিচালক, ফলদায়ক ও সর্বার্থক সাধক।

ফুল ফুটলে যেমন তার সৌরভ আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়ে তেমনি তাঁর আধ্যাত্মানুভূতির কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। শীলের সুবাস যেন তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়ানো। তাঁর সমস্ত সত্ত্বা যেন গভীর শান্তি আপ্লুত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটি সংযমের সুষমা পরিব্যাপ্ত। শান্ত সৌম্য গৌরকান্তি দেহ যেন ঠিকরে পড়ছে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ শীলবান বিচক্ষণ বিনয়ধর, খ্যাতির উচ্চ শিখরে অধিরূঢ়। খরস্রোতা নদী যেমন বাধা প্রাপ্তহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, বনভন্তের জীবন হলো তাই। তাঁর সঙ্কল্প দৃঢ়তর, উৎসাহ অদম্য, তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল, অবিস্মরণীয়, তাঁর সংকল্প অন্ত নেই, সীমা রেখা নেই, যা অগাধ অপরিমেয় অতুলনীয়। অতীতের সঞ্চিত মহান পুণ্যরাশি হবে তাই।

মানুষ চায় অন্তরের শান্তি এবং খুঁজে বেড়ায় আনন্দ। আর্য্য পুরুষ বনভন্তের জীবন একাধারে শান্তি ও আনন্দের পরিবেশক। তাঁর জীবন গভীর প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ, বিপুল আনন্দে আপ্লুত এবং উদার আলোকে সমুজ্জ্বল, তাই বনভন্তে জীবন প্রাণবান্ পাঠকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। তাঁর জীবন সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ সকলের কাছে দুর্নিবার হয়ে উঠে। তাঁর জীবনে প্রত্যেকটি ঘটনা যেন চির নূতন এবং মাধুর্য্যের অফুরন্ত উৎস। এ মহাতপস্বীর তপস্যাপূত জীবনের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবেন শুধু তিনিই যিনি তাঁর মত আর একজন মহাসাধক।

জন্মকথা ঃ

এ মহাপুরুষের জন্মলগ্ন ১৯২০ সালের ৮ জানুয়ারি রবিবার। সাড়া বিশ্বে ইংরেজি নববর্ষের আমেজ উৎসব তখনো কমেনি। আনন্দময় পুলকে ভরা সমগ্র বৌদ্ধ সমাজ। এই সময় আর্য্যশ্রাবক মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির লঙ্কারামে আগমন, মহামান্য ৮ম সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবির সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের জন্য গৃহ ত্যাগ এবং আকিয়াবের উদ্দেশ্যে যাত্রা। আকাশে অনন্ত শূন্যে এক বিরাট জ্যোতিঃপুঞ্জ ফুটে উঠেছে। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র যেন চেয়ে আছে ঐ জ্যোতিঃপুঞ্জের আবির্ভাব প্রতিক্ষায়। রবিবার, আকাশে সূর্যের তেজোদীপ্ত কিরণ সমগ্র জগতকে আলোকিত করে দিলো। দিনের আলো শেষ হয়ে এলো। পূর্ব দিকের অরুনিয়ার তেজোদীপ্ত কিরণ পশ্চিম দিকে হেলিয়ে পড়লো। দূরে গাছপালার আড়ালে সূর্য্য ডুবে গেল। আকাশের অগণিত তারা যেন বেদনাতুরা বিরহিনীর মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সন্ধ্যার মুখরিত ঘনঘটায় বনের পাখিদের কলতানে আনন্দ জয়ধ্বনির মাঝে মহাশুভ লগ্নে এই মহাপুরুষের জন্ম। পুত্র সন্তান জন্ম লাভের কথা শুনে মাতা-পিতা তথা সকলে আনন্দে আত্মহারা। বনভূমির নিস্তব্দতার মাঝে যেন কানে এসে বাজতে লাগলো,

"নিবৃত যে পিতা এ ধরায়
যাহার এহেন সন্তান
সে জননী পেয়েছে তাহাতে
বিপুল শান্তির সন্ধান।"

পুণ্য লক্ষণ অপরূপ সৌন্দয্যে নবজাতককে দেখে জননীর হৃদয় অজানা পুলকে ভরে উঠলো। জননী তাঁর নবজাত শিশুটিকে বুকে নিয়ে গভীর

নিদ্রায়মগ্ন। আকাশে তারার আলোর স্পর্শে তাঁর নাম যেন আগে থেকেই লেখা রয়েছে। সৃষ্টি -স্থিতি-প্রলয়ের আড়ালে অনুপম লালিত্যে ভূমিষ্ঠ দিনের আদ্য অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাঁর নামকরণ করা হয় রথীন্দ্র চাকমা। নব-জাতকের পূর্ব জন্মের কৃত পূণ্যের প্রভাবে ঋদ্ধিমান, ঋদ্ধিশক্তির মতো বিস্ময়কর, অলৌকিকত্বের পূণ্য-ঋদ্ধি বিদ্যমান বলে সকলের কাছে প্রতিভাত হয়।

ফুটফুটে তরুণ রথীন্দ্রের দেহরূপ সৌন্দর্যে কৌতুহলাক্রান্ত জনতা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলো। ছোট বেলা থেকেই রথীন্দ্রের অপরূপ সৌন্দর্য, প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত উজ্জ্বল বদন-মন্ডল সকলকে সত্যই মুগ্ধ করেছে। ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতার পরিশুদ্ধ চিত্তের ফলস্বরূপ এই শিশু বৌদ্ধ জগতে আজ ধর্মজ্যোতিতে জ্যোতির্ময়।

বংশ পরিচয় ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই উপজেলার ১১৫ মগবান মৌজাধীন মোরঘোনা নামক স্থানটি একটি বর্ধিষ্ণু চাকমা বৌদ্ধ জনপদ।

প্রকৃতির প্রাণ-মাতানো রম্যনিকেতন, ভাষায় অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের সমাহার কর্ণফুলী নদীর তীরের বিশাল ঘন ছায়ায় শীতল বনভূমির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে সকলের দৃষ্টিকে অভিনন্দন জানায়। গ্রামের তরুলতা ঘেরা কুঠিরের অধিবাসী সম্মানিত ব্যক্তিযুগল পৌঢ় প্রয়াত হারু মোহন চাকমা তাঁর পিতা। হারু মোহন বাবুর সতী সাদ্ধী পত্নী প্রয়াতা বীরপুদি চাকমা তাঁর জননী। মাতা বীরপুদি চাকমা যেমনি ছিলেন সুরূপা, তেমনি তাঁর মধ্যে ছিল নানা গুণের সমাবেশ। স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর দু'টি মন, অপার স্নেহময়ী পুণ্যশীলা মাতা এবং ধর্মপরায়ণ পিতা উভয়ের কোল আলোকিত করে প্রথম পুত্র রূপে ভূমিষ্ঠ হয় আজকের সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এই পরিবারে পূর্বপুরুষ প্রভূত বিত্তশালী একজন চাকমা রাজা ছিলেন। চাকমা সমাজের নেতৃস্থানীয় খীসা ও ধামী গোজা গোত্র পরিবারের উত্তর পুরুষ নামে এ পরিবারের একটি প্রবাদ আছে। তাঁর বংশ পরিচয় ও জন্মের ইতিকথা অফুরন্ত। সে এক বিচিত্র কাহিনী। ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতার পরিবারে ছয় সন্তান। তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম রথীন্দ্র লাল চাকমা, দ্বিতীয় বৈকর্তন চাক্‌মা (প্রয়াত), তৃতীয় কন্যা পদাঙ্গিনী চাকমা, চতুর্থ জহর লাল চাক্‌মা, পঞ্চম- ভূপেন্দ্র লাল চাক্‌মা, ষষ্ঠ-বাবুল চাক্‌মা। শান্ত, সুন্দর, নির্মল

ছাত্র জীবন ঃ

দিন বইতে থাকে যেমনি বয়। এ শিশুও বাড়তে থাকেন। রথীন্দ্র শৈশব উত্তীর্ণ হবার পর তাঁর পিতা তাকে ভর্তি করে দেন স্বগ্রামের পাঠশালায়। পাঠশালায় পাঠ সমাপ্তির পর পিতা পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় তাঁকে মগবান মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে দেন। এখানে তাঁর বুদ্ধি বৃত্তির বিশেষ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-মাধুর্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছোট বেলা থেকেই তাঁর পাঠস্পৃহা ছিল অসাধারণ। যদিও ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের লেখাপড়া ইস্তফা দিলেন তিনি কিন্তু পাঠানুশীলনে কখনো ক্ষান্ত হননি। অজানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখার ইচ্ছে তাঁর প্রবল। প্রবল ধর্মানুরাগ অদম্য জ্ঞান স্পৃহা তাঁকে যেন চঞ্চল করে তোলে। জীবের প্রতি প্রেম ছিল তাঁর অপরিসীম। ক্ষুদ্র প্রাণীর বেদনায়ও তাঁর হৃদয় বিগলিত হতো। ছোট বেলা থেকে তিনি ছিলেন কৃত পুণ্যবান। তাঁর সেই পুণ্য নিধি হয়েছে সর্ব নিধির আকর।

কর্মজীবন ঃ

তরুণ রথীন্দ্রের কর্ম জীবন শুরু হয় পুরাতন রাঙ্গামাটি বাজারে এক তেলের ডিপোতে। একদা রাঙ্গামাটিস্থ বিরাজমোহন দেওয়ান নামে এক ব্যক্তি তার দোকানে সহযোগিতা করার জন্য রথীন্দ্র চাকমাকে অনুরোধ জানালে তিনি সাদরে তার অনুরোধ রক্ষা করেন। এই দোকানেই তিনি সুযোগ পেলেন প্রচুর বই পড়ার। বালক রথীন্দ্র সময়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী। যার কারণে তিনি অবসর সময়ের মধ্যে ধর্মীয় বই, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর কাব্য, রবীঠাকুরের কাব্য পড়তেন। এমনকি তিনি অদ্যাবধি বঙ্কিম চন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন বই ও রবীন্দ্র সঙ্গীত মনে মনে আবৃত্তি করেন। বৌদ্ধ কীর্তন এখনো তিনি মাঝে মাঝে ছন্দ মিলিয়ে আবৃত্তি করেন। তিনি অনেক সময় নিদ্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বই খুলে পাঠ চর্চায় নিমগ্ন থাকেন। চিন্তা এলো মনে, কি করবেন তিনি। জগত-দুর্লভ এ ভেবে করুণায় বিগলিত হলো তাঁর অন্তর। ঝড়ে পড়লো অশ্রুবিন্দু। এরূপে অতীত হলো বহু দিন। সন্ন্যাস জীবন অবলম্বনে তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মতো উছলিয়ে উঠলো অনির্বচনীয় প্রীতি-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। চিত্ত হলো ভাবাকুলিত। তাঁর মনোরাজ্য হয়েছে পূণ্যতীর্থে পরিণত। ভেঙ্গে গেলো মোহ-নিদ্রা, তিমিরঘন

অন্তরে জ্বেলে উঠলো ভাস্বর আলোক-মালা। তথাগতকে স্মরণ করে আকুল প্রাণের প্রীতি-উচ্ছ্বাসে বলতে লাগলেন প্রভু তথাগত বুদ্ধ, এতোদিন আমার অজ্ঞাত ছিলো এই আলোকোজ্জ্বল সত্য ধর্ম; জানিনি কিরূপ অসদৃশ পুণ্য ক্ষেত্র; বুঝতে পারিনি সত্যদ্রষ্ঠা অদ্বিতীয় মহামানবকে! এখন আমার চোখে আলো জ্বলছে, লোকোত্তর সম্যক সত্যের সন্ধানে।

বৈরাগ্য ঃ

উদাসীনতা রথীন্দ্রের সহজাত। সংসারের কিছুই তাঁকে কোনদিন আকৃষ্ট করতেপারেনি। তাঁর নির্বিকার ঔদাসীন্য সর্বত্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। শৈশব হতে যে বৈরাগ্যের বীজ তাঁর অন্তরে উপ্ত ছিল,তাহা যৌবনে মহামহীরূহে পরিণত হলো। তিনি ভাবলেন নিজের কথা, ভাবলেন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের কথা, ভাবলেন ভোগ-সম্পদের কথা- "জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু আমাকে বেষ্ঠন করে আছে, এগুলোর কবলে পড়লে আমি বিপন্ন। মানবগণও এই দুর্দ্দশায় অতীত নয়। এই ভোগ-সম্পদের পরিণতিও তাই। যেখানে জন্মের আবর্তন নেই, জরার নির্মম স্পর্শ নেই, ব্যাধির উৎপীড়ণ নেই এবং মৃত্যুর সংঘাত নেই, সেখানকার পথ আমি খুঁজিনা কেন? সেই পথ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।" সকল পিতা-মাতার স্বাদ থাকে তাঁদের সন্তানের বিয়ে করানো, পুত্র বধু আসবে এটাইতো স্বাভাবিক। বিধির অমোঘ বিধান রথীন্দ্র চাকমার স্নেহময় পিতা-মাতার সকল তৎপরতা অচিরেই হতাশায় পর্যবসিত হলো। বালক রথীন্দ্রের মনে লুকায়িত বাসনার কথা কেউ কি জানে? এ প্রসংগে একটি ঘটনা বলা প্রয়োজন, একদা মগবান গ্রামে অল্প বয়সী এক সুন্দরী গৃহবধুর অপমৃত্যু হলে শোকাবিভূত স্বামী এবং মাতৃহারা সন্তানের আর্তনাদ তরুন রথীন্দ্রের দৃষ্টি গোচর হয়। অপমৃত্যু কবলিত পরিবারের এই হৃদয় বিদারক আহাজারি রথীন্দ্র চাকমার স্মৃতিপটে সদা-সর্বদা ভেসে উঠে। এই দুঃখময় জড়ানো স্মৃতি তাঁর কোমল অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। দুঃখময় সংসারের দুঃখের নিখুত চিত্র তাঁর মানসপটে ভেসে উঠে। যতই ভাবেন, ততই তাঁর মন সংসারের প্রতি তিক্ত বিরক্ত হতে থাকে। সংসারকে মনে হয় অনন্ত বন্ধনময় কারাগার। ভিক্ষুর বন্ধনহীন পবিত্র জীবন সৌন্দর্যে মাধুর্যে অতুলনীয় বলে তার প্রতিভাত হয়। এর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ তাঁকে উথলা করে তোলে। অবশেষে রাঙ্গামাটি মুদির দোকানে অবস্থান কালে একদিন চট্টগ্রাম পটিয়া উপজেলার নাইখাইন গ্রামের জনৈক স্কুল

মাষ্টার গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সাথে তাঁর পরিচয় হলো। ক্রমেই একে অপরের একান্ত বিশ্বাস ভাজন হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তরুণ রথীন্দ্র তাঁর নিজের হৃদয়ের লুকানো মনো বাসনা গজেন্দ্র বাবুকে ব্যক্ত করেন। গজেন্দ্র বাবু উৎপুল্ল মনোভাবে রথীন্দ্র বাবুকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা বলেন। রথীন্দ্র অস্ফুট স্বরে বলেন সংসারে এত দুঃখ, এত জ্বালা, এ জ্বালার অন্ত কোথায়? মনের এ প্রশ্নটি তাঁর মনে উপ্ত করে বৈরাগ্যের বীজ। তরুণ রথীন্দ্র আর কালবিলম্ব না করে গজেন্দ্র বাবুর সহায়তায় চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পূণ্য দীপ্তিতে সকল দিক উদ্ভাসিত করে চট্টগ্রাম নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে উপনীত হলেন। তাঁর অভীষ্ঠ লক্ষ্য যেন তাতেই মুর্ত হয়ে তাঁকেই আহবান করল। এ সময় নির্বাণ এই শব্দটি তাঁর কানে যেন সুধা ঢেলে দিল। প্রাণ উতলা হয়ে উঠল। মনে হল যেন নির্বাণের আলো তাঁর চারদিকে নেমে আসল এবং সংসার মরুমায়ার মত শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তারই আলোকে তাঁর যাত্রাপথ যেন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর মন আর কোন বাধা মানল না। মুহূর্তের জন্য তাঁর হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে অন্তরের ব্যথা ব্যাপ্ত করে দিয়ে তিনি লঘুপদে উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে যাত্রা করলেন গুরুর সন্ধানে।

দীক্ষা গ্রহণ ঃ

দিন যতই বাড়তে লাগলো, ততই আসন্ন অজ্ঞাত সম্ভাবনায় তাঁর হৃদয় পুলকে শিহরিয়ে উঠলো। অননুভূত উদার স্পর্শে তিনি অভিভূত হতে লাগলেন। ১৯৪৯ সালের কথা। পূর্ণিমা রাত্রির পর প্রভাত হলো, পূর্ব গগণে স্বর্ণ-কিরণ বিকীর্ণ করে দিনমণি আবির্ভাব হলো। পূর্ব দিগন্তের মনোরম সোনালী বর্ণে রঞ্জিত সূর্যরশ্মি হেলে পড়েছে আস্তাচলের পশ্চিম পার্শ্বে। তখন বাংলার বৌদ্ধকুল গৌরব, পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বি,এ, মহোদয় চট্টগ্রাম নন্দন-কানন বৌদ্ধ বিহারে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত। বিরাগী রথীন্দ্র চাকমা মুক্তি কামনায় ও সর্বজীবে উদ্ধারের লক্ষ্যে ঊনত্রিশ বছর বয়সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে শুভ ফালগুণী পূর্ণিমা তিথিতে মস্তক মুন্ডন করে কাসায় বস্ত্র পরিহিত করে শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন। সত্য সুন্দর নির্বাণ অভিমুখী হয়েছে তাঁর সুতীব্র গতিবেগ। যাত্রা করলেন লোকোত্তর পথের সন্ধানে। নিশ্চিত, নিয়ত তাঁর গতি। রুদ্ধ হয়েছে চার অপায় দ্বার। সমুচ্ছেদ হয়েছে সৎকায় দৃষ্টি (আমিত্ব ভাব), অসীম আনন্দ, অফুরন্ত প্রীতি ও অচলা

শ্রদ্ধায় হয়েছে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ। শীল হয়েছে তাঁর অর্ন্তজগতের দীপ্তোজ্জ্বল আলোকমালা। ত্রিরত্নের প্রতি অপরিসীম মমতা এবং প্রিয় হয়েছে তাঁর ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মাচরণ। স্বভাবতঃই তাঁর চিত্ত ত্যাগপ্রবণ, ত্যাগের মাধ্যমেই উপভোগ করেন তিনি অনুপম আনন্দ। দিগ্ যন্ত্রের কাঁটার মতো সেই স্রোতাপন্নাবস্থার একমাত্র লক্ষ্যস্থল অনুত্তর-অচ্যুতপদ, তারই ছোঁয়াছে তাঁর চিত্তে স্বতঃই জেগে উঠে নিবৃত্তির উদগ্র কামনা। রথীন্দ্র বাবু সম্যক সম্বুদ্ধের নীতিকে যে চিত্তে গ্রহণ করেছেন, সে চিত্তের ভাব বড়ো গভীর, বড়ো উদার, বড়ো পবিত্র, অতি মহৎ, অতি শ্রষ্ঠ, অতি সমুজ্জ্বল, অপূর্ব অনুপম, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয়। লৌকিক সম্পদ প্রার্থনা করার পর লোকোত্তর সম্পদ কামনা করলে তখন তাঁর মনে যেন ভেসে উঠে বুদ্ধ যুগের মহা উপাসিকার অপরূপ শ্লোকটির কথা–

"চিরশান্তি লভি যেন এই আকিঞ্চন,
ছিন্ন করি যেন প্রভূ, ভবের বন্ধন।"

তাঁর মন উছলিয়ে উঠলো অনির্বচনীয় প্রীতি-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে। মনে হলো যেন, লব্ধ হয়েছে তার সু-চিরকালের বাঞ্ছিত সাধনা। এবার সিদ্ধ হবে মনো বাসনা, পূর্ণতা হবে কামনা-বাসনা। যেন সেই মোহন সুরই বেজে উঠেছে তাঁর মনোমন্দিরে।

তাঁর এই প্রব্রজ্যা ধর্মের দায়ক ছিলেন শিক্ষক বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়া। মুহুর্তের মধ্যে রথীন্দ্র চাক্‌মা নন্দকানন বৌদ্ধ মন্দিরে 'সাধনানন্দ শ্রামণ'-এ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তাঁর অদম্য জ্ঞান স্পৃহার সঙ্গে নামের সঙ্গতি সত্যিই বিস্ময়কর। এ যেন বিধির অমোঘ নিয়ম। অন্তঃপুর থেকে যেন তাঁর নামটি পাঠানো হলো। 'সাধনানন্দ' নামটি যেন তাঁর জীবনে সার্থক ভাবে রূপায়িত হল। নবদীক্ষিত শ্রামণ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থান করে তিনি যেন হিমালয়ের পাদদেশে বসে হিমালয়ের রূপ, দৃশ্য, উজ্জ্বলতা অবলোকন করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারবেন তাঁর মনে এমন চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হল। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি শিক্ষানবীশ হিসেবে গুরুর নিকট বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। নিজ দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান ছাড়াও তদানীন্তন বাংলার বৌদ্ধ জগতের বহু গুণী জ্ঞানী ভিক্ষুর সান্নিধ্যে আসার সুবর্ণ-সুযোগ হয় শ্রামণের। তাঁর কোমল হৃদয়ের মনোবাসনা ছিল সে একজন শিক্ষিত গুরুর কাছে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং মার বিজয়ী মুক্তি সাধনার পথ নির্দেশে

পরামর্শ লাভে সক্ষম হবেন। কিন্তু জনবহুল এই শহরের ভিক্ষু-শ্রামণ তাঁদের আর্থিক সুবিধা ভোগের প্রত্যাশায় ব্যস্ত দেখে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করলো। এই বিহারের কেউও সত্যানুসন্ধানী কিংবা মার্গলাভী পথের অনুসারী নয় ভেবে তিনি কালবিলম্ব না করে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং বৃহত্তর সন্ধানের আশায় একদিন উষালগ্নে নিজ গুরু শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে বন্দনা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে জননীর জন্ম জনপদে ফিরে গেলেন। সাথে নিলেন গুটি কয়েক ধর্মগ্রন্থ। মাঝ পথে 'চিৎমরম' বৌদ্ধ মন্দির তথা সমগ্র বৌদ্ধদের এক অন্যতম কিংবদন্তী তীর্থ স্থানের কথা তাঁর মনে ভেসে উঠে। তিনি চিন্তা করলেন চিৎমরম বিহারাধ্যক্ষ মারমা ভিক্ষুর শরণাপন্ন হলে হয়তো কিছু সম্যক জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। শ্রামণ উপস্থিত হলেন চিৎমরম বিহারে। নবীন শ্রামণ চিৎমরম বিহারের প্রধান ভিক্ষুকে বন্দনা করে সম্যক জ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে কিছু জানতে চাইলেন। এতে বিহারাধ্যক্ষ প্রায় আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হয়ে শ্রামণকে বল্লেন– 'হে শ্রামণ, এটা খুবই দুর্লভ বস্তু, এটা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। তোমার আমার মত শুধুমাত্র গেরুয়া বস্ত্রধারী ভিক্ষুর পক্ষে সে মহাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এই ভাবে শ্রামণ সাধনানন্দ ধুল্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহার,রেইখ্যং কেংড়াছড়ি বৌদ্ধ বিহারে কিছুদিন থাকার পর তিনি চিন্তা করলেন এভাবে সম্যক জ্ঞান লাভের কোন উপায় নেই। 'জঙ্গল'ই হবে আমার প্রকৃত মঙ্গল'। ধ্যানই হবে একমাত্র জ্ঞানের উৎস। অতঃপর তিনি পূর্ব সংকল্প অনুসারে সকলের অজান্তে 'ধনপাতা' নামক এক গভীর জঙ্গলে এসে প্রবেশ করলেন। এখানে এসে তিনি আর কোন বিহারে গেলেন না। জঙ্গলে গাছতলায় থেকে তিনি গভীর ধ্যান সাধনায় মগ্ন হলেন। মগবান, বালুখালী ও ধনপাতা মৌজার ত্রি-সীমানায় চির হরিৎ বনানী রম্যভূমি ধনপাতা স্থানটি তাঁর বাসস্থানের উপযুক্ত মনে হলো। নীরব নিস্তব্ধ বনের হিংস্র পশু ছাড়া কোন অধিবাসী এই গভীর জঙ্গলে যাওয়ার সাহস পেত না। তরু শ্রেণীর অন্তরালে চাঁদ ডুবার সাথে সাথে যেন আকাশের অগণিত তারা বেদনাতুরা বিরহিনীর মত শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে থাকে। শ্রীমৎ সাধনানন্দ শুধু তাঁর অন্তরের অন্তঃকর্ণে শুনতে পান- 'নির্বাণের সুর' এই অনাদ্যন্ত মৌণ ধ্বনি সঙ্গীতের মত তাঁর কানে বাজতে লাগলো। আহারের সময় আসন্ন দেখে তিনি পাত্র হস্তে পাড়া-গাঁয়ে মাঝে মধ্যে পিন্ডচরণ করার পর বন-জঙ্গলে আহার সেরে ফেলতেন। সমীপর্বতী বনের লোক বসতির চিহ্ন

দৃষ্টির অতীত। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর শুধু বন আর বন। দূর অদূরে জলপ্রপাতের ঝর ঝর শব্দ যেন বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বনকে মুখর করে তুলে। পর্বতশ্রেণী তরঙ্গের উচ্চ নীচু পথ, মাঝ খানে বিস্তৃত সমতল ভূমি অসংখ্য গাছ-পালা বুকে নিয়ে যেন সৌন্দর্যের পসরা খুলে দিয়েছে ধনপাতার বনভূমিতে। লতা-পাতার ফাঁকে শ্রামণের থাকার স্থানটি হচ্ছে তাঁর তপোবন। তপোবন উপযুক্ত জায়গাই বটে, ঘোর সংসারীও যদি এখানে এসে বাস করে সেও তপস্বী হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় শ্রামণ যে বনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সেই বনে (ধনপাতায়) নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ছিল। একদিন এক বাঘ একটি হরিণ মেরে তাঁর সামনে ভক্ষণ করছিল। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রামণের পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পুণ্য রাশি ও পারমীর বলে এবং ইহ জন্মের সত্য, প্রজ্ঞা ও মৈত্রীর প্রভাবে কোন হিংস্র জন্তু তাঁকে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। তিনি অপ্রমত্ত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় ধ্যান সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রামণ ধূতাঙ্গধারী বলে কোন নতুন চীবর গ্রহণ বা ধারণ করতেন না। এক পোষাক মাত্র চীবর। চীবরটি পুরাতন বা ছিন্ন ভিন্ন হতে হতে ব্যবহারের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে। তবু তাঁকে কেউ চীবর দিতে আসেননি এবং তিনি কারও কাছ থেকে চীবর প্রত্যাশা করেননি। শ্রামণের চীবরটি এতই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় যে, যাহা নগ্ন হয়ে থাকার উপক্রম হয়ে যায়। এইভাবে সুদীর্ঘ প্রায় বার বছর যাবৎ তিনি অভিভূত ভাবে কঠোর ধ্যান সাধনায় মগ্ন ছিলেন। বিপুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি কঠোর সাধনায় দীর্ঘ বছর কাটিয়ে দিলেন। তথাগতের ন্যায় রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রকোপ, বিষাক্ত কীট আর জোঁক, মশার দংশন, দিনে-রাতে ভয়াল সর্প, বাঘ ভল্লুক, বন্য হাতির পদচারণ, দেব দানবের কুসংস্কার জাত ভয়ভীতি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামছন্দ, তন্দ্রালস্য, চিত্ত বিক্ষিপ্ততা প্রভৃতি সবকিছুকে তিনি স্বয়ং দুঃখটির স্বভাব নিরোধ ধর্মী বা দুঃখটি জানতে পারায় দুঃখটি চিত্ত হতে সরে যাচ্ছে, পুনঃ পুনঃ সেই দুঃখের উদ্ভব বন্ধ করার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ রূপি জীবন গঠনের উপায়– মনের উন্নতিশীল ভাব তাঁর অটুট রইল। তাঁর মনে হতাশার স্থান নাই, সংকল্পের বিপর্য নেই। তাঁর অচল বিশ্বাস ছিল সিদ্ধিলাভ হবেই, সিদ্ধির গোপন পথ সন্ধানই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সন্ধানীর কাছে সেই পথ অনাবিস্কৃত থাকতে পারে না। শ্রদ্ধেয় শ্রামণের অসীম ধৈর্য ও অতুল পরাক্রম তাঁকে সম্মুখপানে অগ্রসর করে দিল। বিপুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি কঠোর সাধনায় রত হয়ে বদ্ধ

সংকল্প গ্রহণ করলেন। বনের বৃক্ষ হতে ফল চয়ন তাঁর নিষিদ্ধ, স্বয়ং পতিত ফলই ছিল তাঁর ভক্ষ্য, কন্টকরাশি হলো তাঁর আরামহীন শয্যা। উর্দ্ধবাহু, চরম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি তপস্যায় রত ছিলেন। শরীরের প্রতি তাঁর কোন যত্ন রইল না। বহুবর্ষ সঞ্চিত ধূলি-বালুকায় তাঁর দেহ ঢাকা পড়ে গেল। এমতাবস্থায় শ্রামণের চীবরটি এতই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় যে, যাহা নগ্ন হয়ে থাকার উপক্রম প্রায়। এমনকি তাঁর পিণ্ডাচরণে গমন করাও অক্ষম হয়ে যায়। ঠিক এমতাবস্থায় একদিন এক সাত সকালে দেখতে পান যে, এক বড়ুয়া নামের দায়ক চীবর নিয়ে শ্রামণের সম্মুখে উপস্থিত হন। বড়ুয়া দায়ক শ্রামণকে বন্দনা ও প্রার্থনা করলেন চীবরগুলি গ্রহণ করার জন্য। এটাই শ্রদ্ধেয় শ্রামণের ধুতাঙ্গ অবস্থায় প্রথম চীবর দান। অনেকের ধারনা সেই বড়ুয়া পরিচয়ের দায়কটি দেবরাজ ইন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন। এইভাবে সুদীর্ঘ বছর যাবৎ তিনি অভিভূত ভাবে মহাশান্তির মহামৌনতার নিবিড় নীড়ে কঠোর ধ্যান সাধনায় মগ্ন ছিলেন। যার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সুসামঞ্জস্য উদ্যমের ফলে এ সাধনাপদ্ধতি তাঁর শুদ্ধ শান্ত অন্তরে বয়ে আনে একটি অননুভূত আলোর স্পর্শ। তাঁর অনাবৃত দেহ গ্রীষ্মের খরতাপে ও শীতের কনকনে হাওয়ায় অপরিমেয় ক্লেশ বরণ করল।

লব্ধ সাধনার বহি প্রকাশ ঃ

১৯৬০ সালের কথা। গ্রীষ্মের তপ্তশ্বাস ত্যাগ হতে না হতে মেঘজাল বিস্তার করে আবার বর্ষা এসে গেল। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধের দরুন মগবান ধনপাতা সহ সমগ্র নিম্নাঞ্চল এলাকা পানিতে ডুবে যাবার ফলে এলাকাবাসী অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় ধনপাতা নিবাসী জনৈক শ্রদ্ধাবান দায়ক বাবু নিশি কুমার চাকমার প্রার্থনায় শ্রামণ সাধনানন্দ দিঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী নামক গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বোয়ালখালী বিহারে তখন বৌদ্ধ সমাজের অসাধারণ গুণান্বিত মহাপুরুষ শ্রীমৎ গুণালংকারের অন্যতম প্রত্যক্ষ শিষ্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, বোয়ালখালীতে গমন পথে পথিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে চেঙ্গী নামক এক বৌদ্ধ পল্লীতে জনৈক মৃত ব্যক্তির অন্তোষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে প্রার্থনা সহকারে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রামণ সাধনানন্দ যোগদান করেন। ক্রিয়া অনুষ্ঠানে শোকাহত জনতার মাঝে তিনি মিথ্যাদৃষ্টি এবং কুশল- অকুশল সম্পর্কে

ধর্মদেশনা করলেন। বৌদ্ধ সমাজে সংঘদানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাধারনত প্রায় ভিক্ষুরা বিভিন্ন দানীয় সামগ্রীর মধ্যে অর্থদান নিজহস্তে গ্রহণ করে থাকেন। এ নিষিদ্ধ নিয়ম দায়কদেরও অজানা নয়। কিন্তু উক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানে অজ্ঞাত অপরিচিত শ্রামণ কোন দানীয় সামগ্রী এবং বিশেষ করে অর্থগ্রহণে বিরত দেখে সকলে বিস্মিত হলেন। কে সেই এ শ্রামণ! কোথায় তাঁর অবস্থান? এই অপরিচিত শ্রামণকে জানার জন্য কৌতুহল হয়ে উঠল এলাকাবাসীর। ভিক্ষুদের মাঝে অনেকে বল্লেন,– শ্রামণ সাধনানন্দ আমাদের সত্য সন্ধানে পথের নির্দেশ দিলেন। সকলকে অভিলষিত পন্থা অবলম্বন করার কথা বলে গেলেন। দায়কেরা শ্রামণের উপদেশ বাণীতে মুগ্ধ হলেন। শ্রামণের বীণা বিনিন্দিত কোমল-মধুর কণ্ঠস্বর যেন এলাকা বাসীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করলো। উপস্থিত শোকাহত জনতার অন্তরে তখন পুলক শিহরণ জেগে উঠলো। তারা আকুল হয়ে পড়লেন, আরো শুনতে চান শ্রামণের সুধা ঝরা কণ্ঠে সুমধুর ধর্মের অমৃতময় বাণী। জনতার দৃষ্টির মধ্যেও যেন ফুটে উঠেছে কেমন এক বিস্ময় নমনীয় ভাব, আর কেমন এক অজেয় আকর্ষণীয় ভক্তি! নতুন অপরিচিত শ্রামণের কণ্ঠস্বরেও যেন বিরাজ করছে অপূর্ব মধুরতা ও মদিরতা এবং সেই ভাব ভঙ্গীর তরঙ্গ আজো এলাকা বাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। শ্রামণকে অনুসরণ করতে লাগলেন ভিক্ষু এবং গ্রামবাসীরা। বর্ষা কেটে গেল আকাশ বাতাস অভিষিক্ত করে আত্মপ্রকাশ করলো শরতের নতুন মহিমা। শ্রামণের তখন তথাগতের অপূর্ব অনুশাসনের কথা মনে পড়লো। "চরথ ভিক্খবে চরিকং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানং, দেসেথ ভিক্খবে ধর্ম্মং আদি কল্যাণং মজ্জে কল্যানং পরিযোসান কল্যাণং সাত্থনং সন্যঞ্জনং কেবল পরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেথ।" অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য দেশ দেশান্তর বিচরণ করে কল্যাণময় ধর্মের প্রচার কর, পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন কর।" শ্রমণ সাধনানন্দ তথাগতের এই আদেশবাণীকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে জনহিতায়' জনসুখায়' শরতের সুরে সুর মিলিয়ে দিঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী বৌদ্ধ বিহারে পৌঁছে তথায় চারদিন অবস্থান করেন। এই বিহারে অবস্থান কালে তিনি দায়কদের উদ্দেশ্যে বার বার দেশনা করলেন তথাগতের সেই বাণী সমগ্র জগৎ দুঃখ প্রপীড়িত, জন্ম-জ্বরা, ব্যাধি- মৃত্যু শোক অনুতাপ ইত্যাদি অন্তহীন দুঃখরাশি এই জগৎকে ঘিরে আছে। তৃষ্ণা বা

আসক্তিই দুঃখের মূল কারণ বা দুঃখমসমুদয়। আসক্তির বিনাশই দুঃখ নিরোধ বা দুঃখের অবসান। এই বিহারেও তার মন স্থির হলো না। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তিনি একবনে তরুছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিলেন। বনভূমি মধ্যাহ্নের কোলে গভীর সুষুন্দিমগ্ন। চারদিকে তরুলতা সূর্যকিরণস্নাত হয়ে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মনোরম সৃষ্টি,। কোলাহল মাথার উপরে শরতের শুভ্র মেঘ স্তব্ধ হয়ে আছে। শ্রামণ চিন্তা করলেন, এইটাই এখন আমার উপযুক্ত স্থান। ধ্যান রত হলেও যথাসময়ে লোকালয়ে এসে পিণ্ডাচরণ করতেন তিনি। তাঁর দেহের নির্ম্মল আভায় যেন প্রভাতের আলো নিস্প্রভ। শ্রামণের অবস্থান সম্পর্কে বোয়ালখালী এলাকার কতিপয় জনগণ জানতে পারলেন। নির্জন খোলা আকাশের নীচে শ্রামণের অবস্থান দেখে ভক্তগণ উঁচু ভূমিতে তাঁর জন্য একটি আশ্রয় 'ঘর' নির্মাণ করলেন। মৌন-শান্ত সমাহিত ধ্যান মগ্ন শ্রামণকে কিভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন? একদিন যুবক তরুণ দল শ্রামণকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মুগ্ধ ভাব লক্ষ্যকরে তিনি স্নেহসরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎসগণ, তোমরা কি চাও, কোথায় যাবে?" অনুরক্ত যুব-তরুণ দল শ্রামণকে বন্দনা করে উত্তরে জানালেন, প্রভূ 'শ্রামণ' আমরা আপনার সমীপে এসেছি, আমরা আপনার থাকার জন্যে একটি 'গৃহ' নির্মাণ করেছি। আমরা আপনাকে নেওয়ার জন্য এসেছি। তাঁদের কথা শুনে শ্রামণ বললেন– "বৎসগণ, এই বিশাল সংসারারণ্যে তোমরা নিজের সন্ধান না করে পরের থাকার সন্ধান তৈয়ারী করেছ কেন?" যুব-তরুণ দল শ্রামণের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে শান্ত সমাহিত শ্রামণের মুখপানে চেয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রামণ তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করে নির্মিত গৃহে থাকার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বহু বর্ষ সঞ্চিত ধুলি-বালুকায় তাঁর দেহ ঢাকা পড়ল প্রায়। শরীরে হাত বুলানোও তাঁর কষ্টকর ছিল। এইরূপ ছিল তাঁর রুক্ষ্মাচার। লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তিনি বন হতে বনে, এক পাহাড় হতে অন্য পাহাড়ে এবং উপত্যকা হতে উপত্যাকায় আত্মগোপন করতেন। অর্থাৎ সর্বদাই লোকলোচনের অন্তরালে থাকার চেষ্টা করতেন। জনবাদের উপর আস্থাবান হয়ে তিনি আহার শুদ্ধিতে রত হতেন। বিনয়ের প্রতি তিনি কঠোর সংযম, এমনকি পিন্ডাচরণে বের হতে বনাশ্রমে প্রত্যাগমনের সময় অতিক্রান্ত হলে আর আহার না করে উপোস থেকে দিনাতিপাত করতেন। এইরূপ অনাহারের ফলে তাঁর দেহ একেবারে ভেঙ্গে পড়লো, অস্থিপঞ্জর বাহির হলো প্রায়,

চক্ষুদ্বয় কোটরগত হলো। তাঁর শীর্ণ হাত যখন পেটে পড়লো, তখন পৃষ্ঠকন্টক হাতে লাগতো। এক কথায় সমস্ত শরীর একটি চর্ম্মাবৃত কঙ্কালে পরিণত হলো। শরীরকৃত্য করতে গিয়ে তিনি চলা চলের উপযুক্ততা হারালেন। এইরূপে উত্থান-শক্তি রহিত হয়ে পড়লো। ঠিক এই সময় হঠাৎ অজ্ঞাতনামা এক বড়ুয়া দায়ক ফ্লাস্ক ভর্তি কিছু গরম দুধ এনে শ্রামণকে দান করলেন এবং দুধ পান করার প্রার্থনা জানালেন। গরম দুধ পান করার পর তিনি একটু স্বস্তিবোধ করলেন। জনমনে কৌতুহল জাগলো, 'কে সেই বড়ুয়া দায়কটি? বার বার শ্রামণের কাছে আসে। অপরিচিত ঠিকানা বিহীন এই বড়ুয়া দায়কের আজ পর্যন্ত তাঁর কোন পরিচয় মেলেনি। সকলের ধারণা এই বড়ুয়া পরিচয় দায়কটি স্বয়ং স্বর্গের ইন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন।

শ্রামণ আবার সাধনা-পদ্ধতি আরম্ভ করে হৃদয়ে আলোকের স্পর্শ অনুভব করলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। তাঁর মনোজগতে নূতন পরিবর্তন দেখা দিল। মনে হলো, যেন তাঁর লক্ষ্য আসন্ন। অন্তরের সমস্ত মারসৈন্য বা রিপুগুলোকে নির্মূল করে তাঁর চিত্ত হলো মুক্ত বাধনহীন। সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবসান। বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে শ্রামণের মুখ থেকে অভূতপূর্ব বাণী উদ্‌গত হতে লাগলো। তাঁর চোখে মুখে অপূর্ব ধ্যানের দীপ্তি, চারদিকে যেন আলোর ঢেউ বইছে। তিনি চিন্তা করলেন, বুদ্ধের ধর্ম, বুদ্ধের নীতি যে সত্য ধর্ম বা শুদ্ধ জ্ঞানীর বোধগম্য, অজ্ঞানীর জন্য নয়। যারা সংসারে ডুবে আছে তারা মত্ত হয়ে আছে বাইরের রূপে রসে। তারা কোন দিনও বুঝবেনা কার্যকারণের কথা, তাঁরা কোন দিনও বুঝবেনা নির্বাণ কি? তিনি অনেক দিন চিন্তা করলেন, এই জনসমাজে ধর্ম দেশনা করার জন্য যাবেন কিনা? তিনি বুদ্ধের কথা স্মরণ করে বললেন, এই সমাজে সত্য ধর্ম দেশনা বুঝার মতো, উপলব্ধি করার মতো অনেক লোক আছে। শুদ্ধ উপযুক্ত দেশনা করার এবং পরিশুদ্ধ উপদেশকের অভাব। শ্রামণ কথায় কথায় বলতে থাকেন, "তৃষ্ণা বা আসক্তি দুঃখের মূল কারণ, মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই, কিন্তু মানুষ অসহায় ভেবে দুঃখের কাছে বার বার মাথা নত করে। মানুষকে জানতে হবে, দুঃখের মূল যদি নষ্ট করতে না পারে, তা হলে দুঃখ তো যাবে না। মানুষ যা দেখে, যা শোনে, তার প্রতি আসক্তি জন্মায়। এটাই হলো তৃষ্ণা। তৃষ্ণা লতার মত ওতপ্রোতভাবে সবাইকে জড়িয়ে ফেলে। মাকড়সা যেমন নিজের জালে নিজে জড়িয়ে যায়, ঠিক

তেমনি সাধারণ মানুষেরাও নিজের অন্তরের তৃষ্ণায় নিজেই জড়িয়ে যায়। এজন্য তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল কারণ।

উপসম্পদা ঃ

শ্রামণ সাধনানন্দের লোকোত্তর দেশনার বহিঃ প্রকাশ সমগ্র অঞ্চলে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়লো। বসন্তের মায়ামন্ত্রে যেন চারদিকে নূতন জীবনের সাড়া পড়লো। বনানীর শ্যামতর শোভায়, পাখীর কলগানে তাঁরই দুর্বার আনন্দ যেন উচ্ছলিয়ে পড়লো সমগ্র বৌদ্ধ জগৎ। অমিয়-সাগরের শান্তি-সুধা পানে তাঁর হৃদয় হলো তৃপ্ত, শান্ত, অভিরমিত।

ভিক্ষু জীবনের স্থবির- মহাস্থবির হওয়া তাঁর কোন বাসনা ছিলোনা। সমতল ভিক্ষুদের যেরূপ থেরবাদী- চৌদ্ধবাদী, হিনযানী-মহাযানী, থেরো-মহাথেরো হওয়ার স্বাদ শ্রামণ সাধনানন্দের নেই বল্লেই চলে। তাঁর লক্ষ্য দুঃখ মুক্তির উপায়, মার বিজয়ের সাধনা। তথাগতের লক্ষ্যও ছিল এইরূপ। তথাপি পার্বত্য তদানীন্তন চাকমা রাজ সংঘগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের অনুরোধ এবং উদ্যোগে বহু সংঘের প্রচেষ্টায় ১৯৬৫ সালে শ্রামণ- সাধনান্দের উপাসম্পদা কাজ সম্পাদন হয়। তাঁর উপসম্পদা অনুষ্ঠানে যে সকল সংঘগুরু উপস্থিত ছিলেন তৎমধ্যে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির, শ্রীমৎ গুণালংকার মহাস্থবির, শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরসহ আরো অনেক সুখ্যাতি সম্পন্ন ভিক্ষুসংঘ উপস্থিত ছিলেন। শ্রামণ সাধনানন্দ তথাগতের শরণাপন্ন হয়ে উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। শ্রামণ এখন ভিক্ষুতে পরিণত হলেন। বন-জঙ্গলে সাধনা করার ফলে তাঁকে সকলে 'বনভন্তে' বলে থাকেন। এক কথায় তিনি সকলের কাছে 'বনভন্তে' নামে পরিচিত। বাংলার সমগ্র জনতার মধ্যে বনভন্তের আবির্ভাব কলরোল পড়ে গেল। সমবেত জনতার অন্তরে ভাবের বন্যা বয়ে গেলো। যখন ক্রমান্বয়ে তাঁর আলাপ চতুরার্য সত্য নিয়ে গভীর হতে গভীরতর হতে চললো, তখন বহুলোকের ধর্মচক্ষু উত্থীলিত হলো। জনতা তাঁরই শরণ লাভে নিজেদের ধন্য মনে করলো। একদা জনৈক তদানীন্তন দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কতিপয় পুলিশ সিপাহী মারফতে বনভন্তের কাছে কিছু দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করেন। বনভন্তে উক্ত প্রেরিত দ্রব্যাদি অসদুপায় অবলম্বনে অর্জিত অর্থে ক্রয় করত ইহা দিব্য জ্ঞানে জেনে উক্ত সামগ্রী গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং নিগৃহীত হবার কারণও সিপাহীদেরকে

অবহিত করালেন। পুলিশ দল বনাশ্রম ত্যাগ করে থানায় প্রত্যাবর্তন করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ঘটনা জানালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাগে অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় বনভন্তেকে বন্দী করে থানায় নিয়ে আসার জন্যে একদল পুলিশ প্রেরণ করলেন। পুলিশদল পথিমধ্যে প্রথমে কুয়াশাচ্ছন্ন আধার কোন রকম পথ অতিক্রম করে পরবর্তীতে অগ্নি তাপের জ্বালা শরীরে অনুভব হবার কারণে এই বনপদ অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না হলে পুনরায় বিফল মনোরথ হয়ে থানায় ফিরে গেলেন। প্রভাবশালী ভারপ্রাপ্ত কমকর্তা 'ওসি' সাহেব রাগ, অভিমানে ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি স্বয়ং নিজেই উম্মাদগ্রস্ত হয়ে দলবল সহকারে বনাশ্রম অভিমুখে রওনা হলেন। মাঝপথে তাদের আক্রমণ করলো হিংস্র বন্য পশুরা। প্রথমে সাহস করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু যতই বনাশ্রমের কাছাকাছি পৌঁছতে লাগলেন ততবেশী ভীতি ভাব 'ওসি' সাহেবের মনে কম্পিত হলো, মন জড় হতে লাগলো। বনাশ্রম পৌঁছার সাথে সাথে দু'টি অদ্ভূত এবং ভয়াল দৃশ্য 'ওসি' নিজেই দেখতে পান। ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে বাতাসে দোলায়মান বৃক্ষ পত্রের ন্যায় থর থর খণ্ডিত দেহের অংশ নতশিরে প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করছে। ওসি সাহেব কম্পিত স্বরে মুহুর্তের মধ্যে পরম পূজনীয় বনভন্তের চরণে লুটিয়ে পড়লেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁর আশীর্বাদের জন্য শরণাপন্ন হলেন। এমনিভাবে পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী সহ বিভিন্ন মানুষের সাথে বহু ঘটনা জনগণের মুখে মুখে আজো ধ্বনিত হয়। বনভন্তেকে এক নজরে দেখার জন্য তখন থেকে চারদিক হতে দর্শনার্থী জনতা পথ জনাকীর্ণ করে তুলত। তাঁর শান্ত দৃষ্টি, সংযত গতি এবং সমাহিত ভাব শ্রদ্ধায় ও ভাবমাধুর্য্যে জনহৃদয় মথিত করে তুলে। বনাশ্রমের নিস্তব্ধতার ভেতর কোথাও যেন ভাষা ফুটিয়ে আছে, সমস্ত প্রকৃতি যেন এখানে প্রাণবন্ত।

১৯৭০ সাল, সদ্ধর্ম প্রচারের নিমিত্তে দুরছড়ি নিবাসী শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাদের প্রার্থনায় বোয়ালখালী তথা মায়ানী বন আশ্রম ত্যাগ করে কাচালং এলাকার দূরছড়ি নামক স্থানে গমন করেন। ১৯৭১ সাল, পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের সর্বগ্রাসী যুদ্ধের আসুরিক লীলার বোমায় নির্মম আঘাতে সমগ্র দেশ তখন নিশ্চিহ্ন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তখন লংগদু তিনটিলা এলাকা হতে ভাইবোন ছড়া দায়ক-দায়িকাদের প্রার্থনায় মাত্র চার মাস ভাই-বোন ছড়া অরণ্য বন বিহারে অবস্থান করেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পুনরায় তিনটিলাস্থ বনবিহারে ফিরে আসেন।

এই বিহারে অবস্থান কালে ১৯৭৩ সালে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বুদ্ধ যুগের প্রবর্তিত রীতি অনুসারে এ দেশে সর্বপ্রথম চরকায় তুলা হতে সুতা বের করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাপড় বুননের পর চীবর তৈরী করে কঠিন চীবর দানের প্রথা চালু করেন। আজ অবধি এই প্রথা চালু রয়েছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, বুদ্ধ যুগের এই চীবর দানের প্রথা এ দেশের জনগণ ইতিহাসে পড়েছে কিন্তু চোখে দেখেননি কেউ। প্রায় তিন হাজার বছর পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেই আবার এই প্রথা চালু করেছেন এ সমাজে।

কিংবদন্তি রাজবন বিহার ঃ

১৯৭৪ সালের কথা, তখন আকাশের উঠন্ত সূর্য্যের আভায় স্বচ্ছ দর্পনের মত উজ্জ্বল। বনভন্তে ভিক্ষা গ্রহণ সমাপ্তকরে বিহারের দিকে ফিরলেন। ভন্তে'কে দেখে মনে হয় তাঁর পীতবসনের আভায় যেন অপরূপ সৌন্দর্যে মেতে উঠেছে। দূর থেকে দেখা যায় কিছু সংখ্যক যুব-বৃদ্ধের দল বন বিহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যারা আসছেন তাঁরা হলেন স্বাধীন বাংলার প্রথম রাজা মান্যবর ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় এবং রাংগামাটিস্থ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি মহল। তাঁরা এসেছেন বনভন্তেকে ফাং করার জন্যে। তাঁরা অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "'এখন কি শ্রদ্ধেয় ভন্তের দর্শন পেতে পারি; হ্যাঁ এখনই ভন্তের সান্নিধ্যে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। অল্প কিছুক্ষণ পর ভন্তে ধ্যান মগ্ন হবেন। অতঃপর প্রসন্ন চিত্তে ভন্তের চরণাশ্রয়ে বন্দনা করে বললেন, ভন্তে! আমরা আপনাকে ফাং করতে এসেছি। আপনি আমাদের ফাং গ্রহণ করুন। ভন্তে দিব্য দৃষ্টিতে কর্মের ধারা অনুসরণে প্রাণী জগতে যে উত্থান-পতন চলতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করলেন। ইতিকর্তব্যের অবসান ঘটলো। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি মুক্তির কামনায় বন বনান্তরে বাস করি। কিন্তু আমি ইহ জীবনে নির্জ্জনবাসের আনন্দলাভের জন্য এবং আমার অনুগামীদের সম্মুখে, আদর্শ স্থাপনের জন্য স্বধর্ম দেশনায় রত হবো না কেন? অতঃপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে রাজন্য বর্গসহ আগত অনুরক্ত ভক্তগণের নিমন্ত্রণ 'ফাং' গ্রহণ করলেন।

বনভন্তে ১৯৭৪ সালে রাংগামাটি রাজ বিহারে চীবর দান অনুষ্ঠানে আগমন করবেন। তাঁর এ আগমন আনন্দের সাড়া পড়ে গেল সমগ্র এলাকায়। ভন্তের আগমন পূর্বাকাশে ঊষার আলো যেন নতুন রূপে ফুটে উঠলো। উন্মুক্ত রাজ বনভূমি তাঁকে অভিবাদন জানালো। ভন্তের অপরূপ

তেজোদীপ্ত চেহেরার অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে রাজ উদ্যানের চারদিকে বিপুল জনসমাবেশ আগমন যেন পুষ্প কাননে পরিণত হলো। তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনে বহু সন্ধানী আলোর পথের সন্ধান পেলো। বনভন্তের অমৃতময় দেশনা ধর্ম বন্যায় প্লাবিত হলো। তাঁর সুললিত মধুর কণ্ঠের মৈত্রী সূত্রের ভাবময়ী সুমধুর বাণী রাজা প্রজা সকলেই মুগ্ধ। এদিকে চাকমা রাজমাতা মহীয়সী নারী শ্রদ্ধাশীলা মিসেস্ আরতি রায় ও রাংগামাটি উপাসক-উপাসিকাদের আকুল প্রার্থনায়– তিনি রাংগামাটি রাজবন বিহারে স্থায়ীভাবে বর্ষাবাস যাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি রাঙামাটি রাজবন বিহারকে কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করলেন। ভন্তের আগমন এবং স্থায়ী বর্ষাবাস যাপনের পরম আনন্দে রাজপরিবার বনভন্তের সমীপে ১০ (দশ) একর ভূমি রাজবন বিহারের জন্য দান করেন। রাজ পরিবারের এই দান বৌদ্ধ সাহিত্যে অনাথপিণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধ যুগে রাজকুমার 'জেতের' নামানুসারে স্থানটির নাম যেমন 'জেতবন' ছিলো, তেমনি রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে বনভন্তের বিহারের নামকরণ হয় 'রাজবন বিহার'। দেখতে দেখতে তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত সংখ্যা দৈনন্দিন বেড়েই চললো। যুব-বৃদ্ধ বহু পুরুষ ভন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ১৯৭৪ সালে রাজবন বিহারে দ্বিতীয় বার তুলো থেকে সুতো কেটে কাপড় বুনে চীবর তৈরী করে 'কঠিন চীবর দান' করা হয়। রাংগামাটি এ মহাপুরুষের আগমনের শব্দ যেন বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বনকে মুখর করে তুলেছে। পূর্ণিমা রাত্রি তখন জ্যোৎস্না-প্লাবিত অশ্রুধারা চারদিকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে মেতে উঠলো। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের সৌরভ বিকীর্ণ হয়ে নিঃশ্বাস আকুল করে তুলে। এদিকে রাজ পরিবারের শাল বনে বনভন্তের স্থায়ী অবস্থানের সাড়া পেয়ে রাজমাতা আনন্দে মাতোহারা। রাজ মাতা যেন স্বপ্নে দেখছেন– আকাশে, অনন্ত শূন্যে, এক বিরাট জ্যোতিপুঞ্জ ফুটে উঠেছে, রাজ উদ্যানে। চারদিক আলোয় ঝলমল করছে, তার মধ্য দেখা যায় এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ আলোয় ছড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র বনভূমি।

রাজপরিবারের এ স্থানটি ছিল নির্জন, জন কোলাহলের বাইরে এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। শ্রদ্ধাভাজন রাজা এবং রাজ মাতা সহ তাঁর পরিবারগণ তাঁদের প্রিয় উদ্যানটি দান করতে একটুও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। রাজ পরিবার তথা রাঙ্গামাটির শ্রদ্ধাভাজন উপাসক-

উপাসিকাদের নিয়ে সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এই উদ্যানে বনভন্তের জন্য আশ্রম তৈরী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তাঁরা প্রাণ ঢেলে দিনের পর দিন উদ্যানটিকে রমণীয় করে তুলেছেন। রাজ পরিবারের এই ত্যাগের মহিমা বৌদ্ধ জগতে উজ্জ্বল আদর্শ রূপে চিরকাল বিরাজ করবে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, রাঙামাটি রাজ পরিবারের রাজমাতার কথা বলতে গিয়ে আমার বুদ্ধ যুগের বিশাখার কাহিনী মনে পড়ে গেল। মহা শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা পুণ্যশীলা বিশাখা একদিন বুদ্ধের ধর্মকথা শুনতে গিয়ে তাঁর 'মহালতা ভূষণ' বিহার প্রাঙ্গণে ফেলে এলেন। সেকালে এ অলংকার ছিল নারীর এক দুর্লভ সম্পদ। সমগ্র আর্যবর্তে মাত্র তিনজন নারী এতাদৃশ মূল্যবান অলংকারের অধিকারিনী ছিলেন। স্মরণ হওয়া মাত্র বিশাখা দাসীকে বললেন ওহে, তুমি জেতবনে গিয়ে আমার 'মহালতা'টি নিয়ে এসো, যদি ভিক্ষুগণ তা স্পর্শ না করেন; ভিক্ষুগণ স্পর্শ করেন, এই 'মহালতা' তাঁদের হবে। দাসী জেতবনে গিয়ে জানতে পারল– ভিক্ষু আনন্দ 'মহালতা' প্রাঙ্গণ থেকে তুলে সযত্নে বিশাখার জন্য রেখে দিয়েছেন। বিশাখা শুনে হাস্যউজ্জ্বল উৎফুল্ল মনে উচ্চারণ করলেন– আমার প্রিয় সম্পদ আজ ভিক্ষু সংঘের হল। তিনি ঘোষণা করলেন মহালতা বিক্রি হবে। কিন্তু তার উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি নিজেই উপযুক্ত মূল্য দিয়ে মহালতা ক্রয় করলেন এবং সেই বিপুল ধনরাশি ব্যয় করে গড়ে তুললেন শ্রাবস্তীর পূর্ব প্রান্তে এক বিরাট সঙঘারাম। এটিই হল ঐতিহাসিক পূর্বারাম, যেখানে বুদ্ধ ছয় বছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। সেই অমর কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৈত্রী, করুণা ও মাতৃস্নেহের নির্ঝরিনী, দানশীলা, মহীয়সী বিশাখার অমর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তার সঙ্গে। তেমনি রাজ বনের লক্ষ লক্ষ শাল বৃক্ষ সহ অনেক মূল্যবান সম্পদ দান করে রাজমাতা তথা রাজ পরিবার ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে।

রাজবন বিহারে অবস্থান

গিরি মেখলা, চির সবুজ অরণ্য শোভিত মনোরম বৌদ্ধ রাজাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সমতল গ্রাম ছাড়া এই রাঙামাটি শহর। প্রকৃতির প্রাণ মাতানো প্রীতির উচ্ছ্বাসে , জেগে উঠে কুঞ্জে কুঞ্জে, লতাবিতানে, মলয় পবনে, কোকিলের কুহুতানে, মানুষের অন্তর গহনে জেগে উঠে আনন্দের

হিল্লোল, শোভন-মোহন অপুর্ব সমাবেশে। শহরের সমীপবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ ন্যায় রাঙামাটি রাজবন বিহার। আয়তনে প্রায় এক কিলোমিটার। প্রশস্ত হ্রদের স্বচ্ছ নীল আর জলরাশি যেন জননীর নিবিড় স্নেহে দ্বীপটিকে বুকে নিয়ে আছে। জল আর আকাশের নীল গাছপালার সবুজ মিলে রাজবনে যেন রং এর মাতামাতি চলছে। চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটির যে কোন গাড়ী পরিচালককে বললেই হবে, আমি বনভন্তের সান্নিধ্যে যাব। তারা যথাস্থানে নামিয়ে দেবে। গাড়ী থেকে নেমে পাড়া পেরিয়েই নির্জন প্রান্তের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যে মনোরম বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের কাছেই একান্তে একটি নাতিবৃহৎ তোরণ। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখে সভাগৃহ ও অতিথিশালা দাঁড়িয়ে আছে। তার পরেই সবুজ গাছ-পালার আড়ালে ভিক্ষুদের বাসকুঠিরগুলো চোখে পড়ে। অদূরেই হ্রদের বিশাল বিস্তার এর নির্জনতাকে যেন আরও নিবিড় করে তুলেছে। প্রকৃতির এ অফুরন্ত সৌন্দর্যের শীতল বন বিহারের ফুলের সৌরভের মধ্যে রয়েছেন মহাতপস্বী মহাস্থবির বনভন্তে। মুখ উজ্জ্বল প্রশান্ত। শীলের সুবাস যেন তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়ানো।

আলাপ ব্যবহারে একটি সুসংহত ভাব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান। অমিত ধীশক্তি। তিনি যেমনি নির্ভিক তেজস্বী তেমনি করুনাঘন। তাঁর উজ্জ্বল গৌরকান্তি দেহ যেন ঠিকরে পড়ছে। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন গভীর শান্তিতে আপ্লুত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন একটি সংযমের সুষমা পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ দর্শক এ মহাপুরুষকে দেখে সকলে যেন হিমালয়ের পানে চেয়ে নিজের অন্তরের নিভৃত বার্তা শুনতে পান। ফুলের সৌরভ যেমন আলিকুলকে আকষণ করে, তেমনি তাঁর সাধনার প্রভাব অগণিত ভক্তকে তাঁর দ্বারতলে উপস্থিত করে। বৌদ্ধরা আর্যপুদগল রূপে, হিন্দুরা সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে এবং মুসলমানগণ পীররূপে তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধা জানায়।

এ মহাযোগীর সাধনার প্রভাব রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার সীমা চৌহদ্দি ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে, দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সুধী মহলে।

রাজবন বিহারের ভিক্ষুদের জীবন যাত্রা দেশের অন্যান্য বিহারের ন্যায় হলেও বৈশিস্ট্য আছে। এ বিহারে কোন ভিক্ষু-শ্রামণ বৃথা সময় ব্যয় করে না আড্ডা জমিয়ে।

এ বিহারে ভিক্ষুদের আলাপ আলোচনা ধর্মালাপে সীমাবদ্ধ। শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে ধ্যানাভ্যাস এখানকার অবশ্য করণীয়। আলাপ আচরণে প্রত্যেক ভিক্ষুর সংযতভাব উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধের অনুশাসন- ভিক্ষুর স্মৃতিমান সদাজাগ্রত সজ্ঞান সচেতন হয়ে থাকা উচিত। ভিক্ষু জীবনের এ আদর্শ সাধকপ্রবর বনভন্তের অনুশাসনে সকল ভিক্ষুদের জীবনে সম্যক ভাবে রূপায়িত। তাঁর অতন্দ্র অনলস সাধনা প্রাণবান ব্যক্তিমাত্রকেই মুগ্ধ করে। বনভন্তের সাধনার অন্তরালে প্রতিদিন শিষ্যদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা দেশনা করেন। তাঁর উজ্জ্বল তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা যে কত গভীর ও অধ্যাত্মরসসিক্ত তা ভাষায় বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ভাবতে অবাক লাগে, কি আছে এই মহৎ নামটির নেপথ্যে! যেমন কি কোন অপূর্ব অলৌকিক যাদুময়তা আছে এই মহান সাধকের নেপথ্যে! বিগত তিন যুগ ধরে আমরা প্রত্যক্ষ করে আসছি, দলে দলে ভক্ত অনুরক্ত নর-নারীরা ছুটে চলেছেন রাজবন বিহারে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দেখতে যাচ্ছি। তাঁকে বন্দনা করলে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

মানুষের মনের এমনতরো আধ্যাত্মিক প্রভাব সৃষ্টি আধুনিক যুগে বাস্তবিক এক বিস্ময়কর বিরল ঘটনা। তবু সেই বিরল ঘটনার কেন্দ্রভূমি হয়ে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে সাধকপ্রবর সাধনানন্দের দাক্ষিণ্য, মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার অলৌকিক ঋদ্ধিস্পর্শে। তবু ভিক্ষু জগতের এ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সর্বত্যাগী সাধকের এ ত্যাগমহিমা সাধারণের অগম্য। রাজবন বিহারে রয়েছে; এক বিশাল দেশনালয়, মূল বুদ্ধমন্দির, উপগুপ্ত মন্দির, বনভন্তের ভোজনালয়, শিষ্য ভিক্ষু শ্রামণের পৃথক ভোজনালয়, বনভন্তের বাসস্থান, ভিক্ষু-শ্রামণদের পৃথক বাসস্থান, চক্রমন শালা, বিশাল লাইব্রেরী, ত্রিপিটক-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় বই প্রকাশনালয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিশাল মঞ্চনির্মিত ময়দান, অদুরে রয়েছে চীবর সেলাই করার বিশাল ঘর। বিদেশাগত শরণার্থীদের জন্য দুই তলা বিশিস্ট (ভি.আই.পি) রেষ্ট হাউস, চর্তুপার্শ্বে রয়েছে শীর্ষ ভিক্ষু শ্রামণের প্রায় শতাধিক বাসস্থান। মাটির নিচে রয়েছে প্রায় ৫০ ফুট দীর্ঘ বনভন্তের ধ্যান সুরঙ্গ, ভিক্ষু রূপে বরণ করার সীমালয় বা সীমাঘর, নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধ জগতে এই প্রথম ভিক্ষু শ্রামণদের জন্য ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নির্মিত হয়েছে এ দেশের সর্ববৃহৎ দেশনালয়, ভিক্ষুরা ধর্মদেশনা ও ফাং এ যাওয়ার জন্য রয়েছে কয়েকটি গাড়ী। পিণ্ড

চারণের জন্য রয়েছে স্প্রীটবোট। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পাঁচ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আনুমানিক দশ মণ ওজনের অষ্টধাতু নির্মিত দুইটি বুদ্ধ মূর্তি। নির্মিত হয়েছে মহাঋদ্ধিশালী মারবিজয়ী অর্হৎ উপগুপ্ত বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। সামরিক বাহিনীর অনুদানে ও জনগণের শ্রদ্ধাদানে নির্মিত হয়েছে আবাসিক ভিক্ষু নিবাস, নির্মিত হয়েছে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতিমূর্তি। শ্রদ্ধেয় ভন্তের ব্যবহার্য জিনিষগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও স্মৃতি সহকারে অনাদিকাল ধরে রাখার জন্য নির্মিত হয়েছে মিউজিয়াম হল, নির্মিত হয়েছে রাজবন বিহারের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন কাজে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা প্রদানকারীর কেয়ার টেকারের বাসস্থান। এ সকলই দানের প্রভাব।

পরিকল্পনাধীন রয়েছে ঃ

১। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সদিচ্ছা– মৃত ব্যক্তি পোড়ানোর জন্য একটি বৈদ্যুতিক চুল্লী।

২। ধর্মীয় পুস্তক, প্রচার পত্র ও অন্যান্য ধর্মীয় বাণী প্রচার প্রকাশনা ও প্রসারকল্পে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা।

বনভন্তের শিষ্যদের নিয়ম ঃ

বিশাল ও বিলাসবহুল এ রাজবন বিহার বাহির থেকে দেখলে যাহা মনে হয়, কিন্তু ভিতরে তা নয়। এখানকার ভিক্ষু-শ্রামণেরা আরাম করে (যেমন লেপ-তোষক কিংবা বালিশ মাতায় দিয়ে) নিদ্রা যাওয়া থেকে বিরত। পাত্র (ছাবাইক) ব্যতীত আহার করা নিষিদ্ধ। কোন গৃহীর সাথে অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব নিষিদ্ধ, সমতল ভিক্ষুদের ন্যায় টেলিভিশন, ভিসিয়ার, সিনেমা দেখা নিষিদ্ধ। দোকানে গিয়ে কোন ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, টাকা-পয়সা হাতে ছোয়া কিংবা তার নিজের শরীরে রাখা এবং কারো কাছ থেকে নেওয়া নিষিদ্ধ।

ভাবতে অবাক লাগে, বিনয়ের প্রতি এত কঠোর হওয়া এই সমাজে বিরল। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্যরা কোন টাকা না ছুঁয়ে তাঁদের নিজ গাড়ীতে করে ভারতের বৌদ্ধ তীর্থ স্থান গুলো পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে। বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুশাসন কোন রূপ ব্যতিক্রম দেখলে ক্ষমা করে না। বিনয়ের কোন অনিয়ম হলে সাথে সাথে চীবর ত্যাগ করে গৃহী জীবন অবলম্বন করতে হবে। প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধ যুগের এই অনুশাসন একমাত্র বনভন্তে আবার নব জাগরণের সৃষ্টি করেছেন।

তাইত ছুটে চলেছেন প্রতিদিন দেশ বিদেশের বহু পূণ্যার্থী এ তীর্থদ্বারে। কবি গুরুর ভাষায় বলতে হয়,–

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার"

কবিগুরুর সাথে সুর মিলিয়ে আজ আমরাও বলবো.–

"পূর্বেতে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার।"

বনভন্তের বিনয় শাসন পদ্ধতি ঃ

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সর্বাঙ্গে পরিব্যপ্ত সংযমের সুষমা এবং মৈত্রী করুণা স্নিগ্ধ চাহনি সহজেই জনমনকে অভিভূত করে। এ মহাপুরুষের যে যতই সান্নিধ্যে যাক না কেন, প্রতিদিন তাঁর এক নতুন রূপ বলে মনে হবে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি সাধারণের অগম্য এক রহস্যময় পুরুষ। যারা তাঁর সংস্পর্শে আসেন, তাদের মধ্যে সকলেই তাঁকে অতি মানব বলে মনে মনে বন্দনা করেন।

এতাদৃশ এ মহাপুরুষ সাধারণজনের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। তাই তাঁর আলাপ আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্বন্ধে জানার জন্য স্বতঃই কৌতুহল জাগে। আমাদের বর্তমান সমাজে অনেক মা-বাবা তাদের ছেলেদের নিয়ে যান বনভন্তের সান্নিধ্যে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা গ্রহণের জন্য। কিন্তু অনেকেই সেই আশা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। প্রশ্নজাগে মনে, কেন বনভন্তে বর্তমানে শ্রামণ(প্রব্রজ্যা) এবং উপসম্পদা প্রদান থেকে বিরত। বনভন্তে কোন ছেলেকে প্রব্রজ্যা প্রদান কিংবা উপসম্পদা প্রদানের ক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে অনেক। শর্তের মধ্যে যেমন– টাকা -পয়সা গ্রহণ কিংবা ব্যাংকে জমা রাখা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। যে কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা। রাত্রে চার ঘন্টার বেশী না ঘুমা। অপ্রয়োজনীয় আলাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখা। কি খাবে? কোথায় খাবে? আমার বিছানা কোথায়? কে আমাকে পালন করবে? এ ধরণের চিন্তা থেকে বিরত থাকা। অভাবের কারণে প্রব্রজ্যা কিংবা উপসম্পদা গ্রহণ করে গৃহিদের উপর সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করে পরবর্তীতে পবিত্র চীবর ত্যাগ করে বিয়ে করা এসকল মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। বস্তুত চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্মচর্যার ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ, সুন্দর না হলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয় না। পতিত জমি আবাদ করে

সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমেই আগাছা তুলে ফেলে জমি পরিস্কার করতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সর্বাগ্রে দুঃশীলতা, দুর্নীতি বিদূরিত করে চরিত্র শোধন আবশ্যক। শুদ্ধ চরিত্র তার সুফল অনেক। পরিশুদ্ধ রূপে শীল পালন না করলে ভিক্ষু ভিক্ষু নয়, ভিক্ষুনী ভিক্ষুনী নয়, উপাসক উপাসক নয়, উপাসিকা উপাসিকা নয়। এক কথায়, বুদ্ধ শাসনে শীলহীন দুশ্চরিত্রের স্থান নেই। নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা। যে অজ্ঞব্যক্তি দুঃশীলের সঙ্গ করে, শীলবান, সুচরিত্র পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে না, নিয়মভঙ্গে দোষ দেখতে পায় না এবং মিথ্যা সংকল্পানুগ হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে না, সে ব্যক্তির শীলের অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, অনুনা সম্পন্ন ও গৃহস্থ এ আশ্রমগুলির প্রতিপাদ্য শীলের বিভাগ ব্যাপক। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, অসত্য-ভাষণ এবং মাদকদ্রব্য সেবন ও পাঁচ প্রকার অসদাচরণ থেকে বিরত হয়ে সদ্‌ভাবে থাকাই পঞ্চশীল পালন। মোটামুটি একে বলা হয় গৃহীশীল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী হবার জন্য যথাক্রমে পুরুষ ও নারী যখন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের বলা হয় অনুপসম্পন্ন শীল। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণালী ভিক্ষুশীল এবং ভিক্ষুনীদের জন্য প্রবর্তিত নিয়মগুলি ভিক্ষুনী শীল। ভিক্ষু-ভিক্ষুনীশীলকে একত্রে বলা হয় প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল। বীর্যবান, উদ্যমশীল হয়ে পালন করতে হয় আজীব-পরিশুদ্ধি শীল। আজীব শব্দের অর্থ জীবিকা। শুদ্ধ জীবিকাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আহার্য্যদি লাভের সকল হীন পন্থা বর্জনীয়। এমন কি ভিক্ষুর পক্ষে খাদ্য, পরিচ্ছদ লাভের সংকেত দান পর্যন্ত নিষিদ্ধ। বনভন্তের এইসব নিয়ম মানতে হবে। সাত দিন কিংবা দশ দিনের জন্য প্রব্রজ্যা প্রদান বনভন্তের গ্রহণযোগ্য নয়। বনভন্তের যে কোন শিষ্য যদি কোন বিনয় লংঘন করে থাকে ঐ শিষ্যকে সাথে সাথে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়ে বহিস্কার করে দেন। এভাবে অনেক ভিক্ষু, শ্রামণ শিষ্যকে বিনয় লংঘনের কারণে বহিস্কৃত হতে হয়েছে। এ প্রসংগে অরবিন্দু বড়ুয়ার দেশনা বই থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যায়– এক সময় এক যুবক শ্রামণ এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্ম দেশনার সময় এক মহিলার প্রতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শ্রামনের এ নীরব দৃষ্টির প্রতি বনভন্তের লক্ষ্য করলেন। এমতাবস্থায় ঠিক দুই দিন পর শ্রামণকে রসিকতার সুরে বনভন্তে জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি রাঙ্গামাটির কোন্ কোন্ মহিলাকে চিনো? শ্রামণ কয়েক জন মহিলার নাম বলার পর

বনভন্তে বললেন.– অমুক মহিলাকে চিনো নাকি? শ্রামণ- হ্যাঁ ভন্তে! চিনি। বনভন্তে ঃ সে সুন্দরী কিনা, শ্রামণঃ হ্যাঁ, ভন্তে। বনভন্তে ঃ তাহলে তুমি একটি কাজ কর, সাদা কাপড় পড়ে এসো। শ্রামণ বুঝতেও পারলনা তার এ পরিণতি হবে। শ্রামণকে মুহুর্তের মধ্যে চীবর ত্যাগ করিয়ে সাদা কাপড় পরিধান করিয়ে বিহার থেকে বিদায় করে দিলেন। কঠিন বনভন্তের অনুশাসন। যারা এই কঠিন অনুশাসন মেনে বিনয় রক্ষা করতে পেরেছেন তাঁরাই প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষু।

বনভন্তের নিয়ম কারো কাছ থেকে কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ। দান না চাইতে দান এসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বর্তমানে বনভন্তের আদর্শে পরিচালিত শাখা বন বিহারের সংখ্যা প্রায় বিশখানা। সমগ্র পার্বত্য বনজঙ্গলে বিহার ছাড়া ধ্যান রত আছে প্রায় তিন শতের মতো ভিক্ষু শিষ্য। শিষ্য ভিক্ষু-শ্রামণ প্রায় আট শত। অফুরন্ত দানীয় সামগ্রী প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ হচ্ছে রাজবন বিহার। রাংগামাটি বুদ্ধিজীবি মহল এই বিশাল তীর্থ স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বিশাল কমিটি গঠন করেছেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আমাদের সমতল বৌদ্ধদের নিয়ম বিহার কমিটি বা সমিতির মাধ্যমে বিহার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু সাধারণতঃ পরিচালিত হয়। রাজবন বিহারে এই নিয়ম ভিন্ন, কমিটির কাজ বিহার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুন্দররূপে পরিচালনা করা। কিন্তু কমিটির মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কিংবা তাঁর শিষ্যরা পরিচালিত নয়। তাঁরা বনভন্তের আদর্শে নিজ নিজ বিনয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বনভন্তের কোন শিষ্যদের ফাং করা হলে, তাঁদের নিয়ম বিনয় আলাদা ভাবে পরিলক্ষিত হয়। চিনিয়ে দিতে হয় না এই ভিক্ষু কার শিষ্য, তাঁরা সহজেই সভা মন্ডপে ফুটে উঠেন উনারা বনভন্তের শিষ্য। মহামনীষী সাধনানন্দের কর্মকুলতারই স্মরণীয় স্বাক্ষর। কর্মের সাথে প্রজ্ঞার এমন অপুর্ব সমাবেশ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। আত্মোন্নতির সাথে সাথে সমাজ ও সদ্ধর্ম হিতৈষনায় যে মহৎ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে চলেছেন তা এদেশের বৌদ্ধধর্মের পূর্ণজাগরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। সদ্ধর্ম সাধক বনভন্তের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি হচ্ছে বিদর্শন সাধনা। জগৎ ও জীবনকে বিশেষরূপে দর্শনের কঠোর সাধনায় তিনি ব্রত রয়েছেন এখনো। বনভন্তে বলেন– হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুর কথা মনে পড়লে সকলের মন শিউরে ওঠে। মৃত্যু খুবই ভয়ঙ্কর। তাই বলে মৃত্যু কাউকে ছাড়ে না। মৃত্যুর কোন কালবিচার নেই– শৈশবে,

কৈশোরে, যৌবনে, পৌঢ় বয়সে যে কোন কালে মৃত্যু আসতে পারে। মৃত্যুর কালগ্রাস মানে অবাঞ্ছিত বিদায়, চিরতরে বন্ধুবান্ধব থেকে, আত্মীয় স্বজন থেকে, পুত্র-পরিবার থেকে, পরিচিত পরিবেশ থেকে এমনকি আপনার পরমাদরের দেহ থেকেও। এ মৃত্যু এ বিদায় কত করুণ, কত বিষাদময়! মৃত্যু ঘটে ব্যাধিতে, দণ্ডাঘাতে, অস্ত্রাঘাতে, সর্পদংশনে, হিংস্রজন্তুর আক্রমণে, বজ্রপাতে, বিষ প্রয়োগে আরও কতভাবে। যে ভাবেই মৃত্যু হোক না কেন, মৃত্যু ভয়ঙ্কর। তাই বুদ্ধ বলেছেন,– 'মরণম্পি দুক্খং' অর্থাৎ মৃত্যু দুঃখময়।

জীবন হলো নানা শোকের করাল ছায়া। পিতৃশোক, মাতৃশোক, পুত্রশোক, কন্যা শোক, ভ্রাতৃশোক, পতিশোক, পত্নীশোক, আরও কত রকমের শোক আছে। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় হৃদয়ের যখন উথলে উঠে, তখন মনে শেলের মত বিঁধে। শোকার্ত ব্যক্তি দুঃসহ বেদনায় আর্তনাদ করে, শোকের মত হৃদয়বিদারক কি আছে? শোকের লোক চৈতন্য হারিয়ে ফেলে, এমন কি উন্মাদ হয়ে যায়। এ জন্যই শোক দুঃখময়। যেমনি অর্থ-যশ, মান-সম্মান, সুখ-সমৃদ্ধির জোয়ার আসে, তেমনি হয় অর্থহানি, যশহানি, সম্মানহানি, আরও কতরকমের ক্ষয়ক্ষতি। ক্ষয়ক্ষতি যথন আসে তখন 'আমার সর্বনাশ হল' বলে ক্ষোভে, বিষাদে, ভেঙ্গে পড়ে। তার অন্তর জ্বলতে থাকে ক্ষোভ, বিষাদ, দুঃখে। মানুষ চায় প্রিয়জনের সঙ্গ। যে যাকে ভালবাসে, তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না, কিন্তু জগতের অমোঘ নিয়মে প্রিয়জনকে ছাড়তেই হয়, বিদায় দিতে হয়। এ প্রিয়বিয়োগের মর্মান্তিক কান্নায় সারা বিশ্ব যেন সকরুণ। দুঃখ, দুঃখ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। অকারণে কিছুই হয় না। দুঃখ যেমন আছে তেমনি দুঃখের কারণও আছে। জন্ম যদি না থাকে, তাহলে দুঃখ ভোগের অবকাশ থাকে না। তৃষ্ণা বা আসক্তির উদ্দামতাই জীবনকে জন্ম-জন্মান্তরের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। প্রিয় এবং প্রেম থেকেই সংজাত হয় শোক আর ভয়। এই জন্য বুদ্ধ বলেছেন–

"স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদি প্রিয় বস্তু হতেই প্রেম সংজাত হয়, প্রেম থেকেই উৎপন্ন হয় শোক আর ভয়। যাদের স্ত্রী পুত্র বিষয় আশয়ের প্রতি প্রেম বা আসক্তি নেই তারাই সর্বতোভাবে হয় শোক ও ভয় থেকে বিমুক্ত।" (ধর্মপদার্থ কথা)

বিদর্শন সাধনায় তাঁর পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধিলাভের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে বিশ্রুত। যার কারণেই দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে লোক আসছে রাজবন বিহারে বনভন্তেকে দেখার জন্য। একবার যারা তাঁর প্রীতি সান্নিধ্য পেয়েছেন ও প্রাঞ্জল ধর্মদেশনা শুনেছেন তারা বারবারই সমবেত হয়েছেন সেই তীর্থ দ্বারে। একটি নিরভিমান ব্যক্তিত্ব ও সুমধুর সারল্য সর্বক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাঁর সমগ্র অস্তিত্বে। জ্ঞানের গরিমা আছে, অহমিকা নেই, চিন্তায় ও কর্মে বলিষ্ঠ প্রত্যয় আছে অথচ দাম্ভিকতা নেই, সাফল্যের কিংবা কৃতিত্বের সন্তুষ্টি আছে কিন্তু আত্ম প্রচারণার উদগ্র বাসনা নেই। বনভন্তে তাঁর ধর্মামৃত দান দ্বারা দেশ ও সমাজের অসংখ্য নর-নারীর অন্তরের অজ্ঞানতা অন্ধকার বিদূরিত করে তাদের হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন। বহু ধর্মপ্রাণ যুবককে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা প্রদান করে এবং ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দিয়ে তাদের যেমন অপ্রমেয় হিত করছেন তেমনি বুদ্ধ শাসনকেও চিরস্থায়ী করছেন। পরম পুজ্য সাধকপ্রবর বনভন্তে আত্মহিত ও পরহিত সাধনের মাধ্যমে যে আদর্শ মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন তা শিক্ষিত এবং জ্ঞানী যুবক-যুবতী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

বনভন্তের চীবর দান ঃ

নয়নাভিরাম অপূর্ব দৃশ্যাবলী বুদ্ধযুগে প্রবর্তিত কঠিন চীবর দান ইতিহাসে জেনেছেন সকলে। বাস্তবে দেখেছেন বলে মনে হয়না। সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে ১৯৭৩ সালে সর্ব প্রথম এদেশে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন কঠিন চীবর দান কিভাবে করতে হয়। তথাগত বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তী জেতবনে অনাথপিন্ডদের আরামে অবস্থান করার সময় পাঠেয়বাসী ৩০ জন ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান সম্বন্ধে যে বিধান দিয়েছেন, সেইরূপ শ্রীমৎ বনভন্তেও তাঁর শিষ্যদের বিনয় বিধান শিখিয়েছেন। তথাগতের অভিমত বাক্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে সানন্দে শিরধার্য্য করেছেন। তাঁর বহু দিনের কল্পিত মনোবাসনা যেন পূর্ণ হলো। শ্রীমৎ বনভন্তে চীবর তৈরীর উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, পুণ্য অনুমোদনের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, প্রীতি ও গৌরব। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ কুশল কর্মের সমবায়ে পুণ্যানুমোদনই মহান তেজঃপূর্ণ ও শক্তিশালী পুণ্যের জনক। ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয়বার বুদ্ধ যুগের অনুরূপ কঠিন চীবর দান প্রচলন করেন রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে। রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের পরম

পূজনীয় বনভন্তের প্রচলিত চীবর দান দেখলে মনে হয় যেন, আমরা এক নতুন যুগে এসে পৌঁছেছি। দিব্য-ঐশ্বর্য্য ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ভরা অপূর্ব দৃশ্যাবলী। আশ্চর্য মনোরঞ্জন, নয়ন-তৃপ্তিকর দীপ্তোজ্জ্বল সাধক প্রবর শ্রীমৎ বনভন্তের চীবর দান। প্রজ্ঞা-শীলে অলংকৃত ও শান্তচিত্তের অধিকারী বনভন্তের শ্রাবক সংঘ, নানা বর্ণের দর্শনার্থীর সমাগমে মুখরিত রাজবন বিহারের চীবর দান যেন মহা-আনন্দময় স্বর্গরাজ্যে পরিণত। বুদ্ধ যুগের মহা-উপাসিকা পুণ্যবতী বিশাখা প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের চীবর দান ২৪ ঘন্টার মধ্যে দান কার্য্য সম্পাদন করা খুবই শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এই যুগে সত্যিই বিরল।

দেশের সর্ববৃহৎ কঠিন চীবর দান রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দান। প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাগমে এই চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়। যারা চীবর তৈয়ারী করবে তাঁরা দিন বারটার মধ্যে আহার সেরে শীল গ্রহণ করে চীবর তৈয়ারীর কাজে নিয়োজিত হন। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই চীবর তৈয়ারী করে তারপর দিন মহা সমারোহে শ্রদ্ধাচিত্তে বনভন্তেকে চীবর দান করেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, সমতল বৌদ্ধদের চীবর দান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এম. পি. বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হিসেবে নিয়ে তাদেরকে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের সাথে বসিয়ে ফুলের তোড়া, ক্রেষ্ট প্রদান সহ বিভিন্ন উপাধি দিয়ে অভিনন্দিত করানো হয়। অভিনন্দিতরা এই সম্মানের জন্য পাঁচ, দশ, বিশ এমনকি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন। বনভন্তের চীবর দান অনুষ্ঠানে কিন্তু এ সকল নেতা মন্ত্রীর কোন স্থান নেই। তাদের জন্যে বিশেষ কোন আয়োজন নেই। বনভন্তের চীবর দানে লাখো জনতার সমাবেশে কারো আগ্রহও থাকে না কোন নেতা-নেত্রীর লেকচার বক্তব্য শোনার। রাজবন বিহারের যে দিন চীবর দান তার একদিন আগে হতে দূর দূরান্ত থেকে জনতার ঢল চারদিকে দুর্বার হয়ে উঠে। রাতভর বিভিন্ন ধর্মীয় দেশনা এবং চীবর তৈয়ারীর মাধ্যমে রাত কেটে যায় সকলের। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য রাজবন বিহার কমিটি বিভিন্ন কার্যালয় স্থাপন করেন। নির্ধারিত দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব হতে বিভিন্ন শাখা বিহার থেকে সশিষ্য ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ রাজবন বিহারে সমবেত হয়। শীতবাস পরিহিত ভিক্ষুদের গমনাগমনে রাজবন বিহারের বিভিন্ন পথ সমূহ নূতন শোভা ধারণ করে। কৌতুহলাক্রান্ত জনতা নানা দেশাগত

এই নূতন অতিথিদের সমাবেশ দেখে বিস্ময়বিমুদ্ধ সকলে। বনভন্তের চীবর দানের এই দৃশ্য প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

লেখক রূপে বনভন্তে ঃ

বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তার একনিষ্ঠ কর্ম সাধনার ফল সুদূর প্রসারী। সুত্ত নিপাত তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুবাদ। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে তৎ অনুদিত সুত্তনিপাত গ্রন্থে। যাহা চট্টগ্রাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পালি বিষয়ক এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্য নির্বাচিত। তাঁর এই অনবদ্য অনুবাদ পদ্ধতি বিজ্ঞকুল প্রসংশিত। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি শুদ্ধ 'সুত্ত নিপাত' অনুবাদ করে ক্ষান্ত হননি। বনভন্তে তাঁর শিষ্যদের প্রতিনিয়তি বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন বই পড়া অনুশীলন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি গণের পুরাতন কিংবা নতুন ধর্মীয় বই এর পান্ডুলিপি রাজবন বিহার থেকে নিয়মিত ছাপিয়ে পাঠক মহলে বিনা মূল্যে বিতরণের নির্দেশ দেন। এই পর্যন্ত বনভন্তের নির্দেশে প্রায় ২০টির মতো ত্রিপিটকের খন্ড বিশেষ বই প্রকাশ ও পুনঃ মুদ্রণ হয়েছে। সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বনভন্তের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি মহৎ আদর্শ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া সংকলিত 'বনভন্তের দেশনা' নামক ২য় খন্ড গ্রন্থে লিখেছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অনেক বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। তদ্‌মধ্যে ১০টি সঙ্গীত তিনি তাঁর দেশনা বইতে উদ্ধৃত করেছেন। বনভন্তে তাঁর সাধনার অন্তরালে প্রতিদিন শিষ্যদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা, ধর্মদেশনা, বিনয়ের অনুশাসন সম্পর্কে শিক্ষাদান করে চলেছেন। তাঁর উজ্জ্বল তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা যে কত গভীর ও আধ্যাত্মরস সিক্ত তা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এক সময় এক সমতল ভিক্ষু রাজবন বিহারে গিয়ে দায়ক দায়িকাদের বলেন, বনভন্তে যেমন চীবর পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু, আমরাও চীবর পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু– আমাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বনভন্তে ঐ ভিক্ষুর সংলাপ না শুনেও অল্প কিছুক্ষণ পর দেশনায় বলেন,– পরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ করলে এবং শুধু মাত্র চীবর পড়লে, তাদেরকে বৌদ্ধ ভিক্ষু বলা হয় না। অকুশল ও অশোভন আচারে কলঙ্কিত ব্যক্তি শুধু ভিক্ষুব্রত গ্রহণে ভিক্ষু হয় না। যিনি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাপকে অতিক্রম করেন এবং সর্ব বিষয়ে সজ্ঞান থাকেন, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু।

বনভন্তের দেশনা ও বাণী

১৯৯৫ সালের কথা, বনভন্তের সান্নিধ্যে গিয়েছি আমি একা, বন ভন্তের সান্নিধ্যে যতবার গিয়েছি আমি প্রায় সময় একাই গিয়েছি। সেই দিন কোন সরকারী ছুটির দিন ছিল না। রাঙ্গামাটি পর্যটক হিসেবে আসলেন ঢাকা থেকে তিন ডক্টরেট প্রফেসর। নিজ নিজ পরিবার সহ তাঁরা রাঙ্গামাটিতে এসে জানতে পারলেন, এখানে রাজবন বিহার নামে একটি বৌদ্ধ বিহার আছে। ঐ বৌদ্ধ বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ মহোদয়ের নাম (বনভন্তে) তাঁরা আগে থেকেই শুনেছেন। তিন ডক্টরেট প্রফেসরগণ রাজবন বিহারে দেখতে এলেন। বিশাল শালবনের মধ্যে শান্ত পরিবেশের মাঝে অপরূপ সৌন্দর্য্যে মনোরম রাজবন বিহারের দৃশ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। তাঁরা বনভন্তের এক শিষ্য ভিক্ষুর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন বনভন্তের সাথে দেখা করা যাবে কিনা। অনুমতি পেলেন তাঁরা। আগত প্রফেসরগণ ভন্তের সামনে গিয়ে কেউ বললেন– আদাব, কেউ বললেন নমস্কার, একজন শুধু হাত তুলে অভিবাদন জানালেন। তাঁরা তিন জনই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাঁরা বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম সম্বলিত অনেক বই পড়েছেন। তাঁরা ভন্তের কাছে কিছু প্রশ্ন করবেন। অনুমতি চাইলেন, প্রশ্ন করতে পারবেন কিনা। বনভন্তে সম্মতি জানালেন মৌনভাবে। একজন প্রফেসর বললেন, আমরা আপনার কাছে একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। ভন্তে বল্লেন, প্রশ্ন করুন। আগত প্রফেসর– বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি শব্দ বার বার উচ্চারিত হয়, সেই শব্দটি হলো 'নির্বাণ'। সেই নির্ব্বাণে কি ভাবে যাওয়া যায়? নির্বাণের পথটি কি? উত্তরে বনভন্তে বলেন, – একজন বাল্যশিক্ষা ছেলেকে যদি এম,এ, বই এর কথা বলা হয়, সে কি বুঝবে? এইভাবে ভন্তে তিন বার বলার পর আগত প্রফেসর গণ মনে মনে ভন্তের প্রতি মনক্ষুন্ন হলেও ভন্তেকে জানালেন, আমরা তিন জনই প্রফেসর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছি। আমরা আপনার উত্তর বুঝতে পারবো। তিন প্রফেসরের মনে এ মনোভাব আসলো যে, বনভন্তে তেমন লেখাপড়া জানে না, সুতরাং এই জটিল ও কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ভন্তে তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে উত্তর শুরু করলেন, এবং বললেন– দেখো, "আমি তোমাদেরকে যদি বলি ঢাকা থেকে আমার জন্য একটি কমলা কিনে নিয়ে আস।" তোমরা কিভাবে কমলাটি আমার জন্য নিয়ে আসবে? তিন ডক্টরেট একসাথে উত্তর দিলেন, কেন ঢাকা থেকে আপনার জন্য একটি কেন শতটি কমলা কিনে আপনাকে

দেবো। কিন্তু এটাতো কোন প্রশ্ন কিংবা আমাদের প্রশ্নের উত্তর হলো না। ভন্তে আবারো ঐ প্রথম কথাটি বল্লেন যে, একজন বাল্য শিক্ষার ছেলেকে যদি এম, এ বই এর কথা বলি সে কিছুই বুঝবেনা। আমি তোমরা তিন ডক্টরেটকে এই মুহুর্তে বাল্য শিক্ষার ছেলে বলে মনে করলাম। আমিসহ আরো দুই জন বনভন্তের শিষ্য শ্রামণ উক্ত ঘটনায় ছিলাম। আমি নিজেও চিন্তা করলাম যে প্রফেসর তিন ব্যক্তির প্রশ্নের সাথে ভন্তের উত্তর বা কোন কথার মিল নেই। অনেক ক্ষণ পর প্রফেসর তিন জনের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, আমরা আপনার কাছ থেকে জানার আগ্রহ ছিল। 'নির্বাণ' কি এবং নির্বাণের পথ কি? ভন্তে আবার ঢাকা থেকে কমলা আনার কথা বল্লেন। প্রফেসরগণ বললেন ঢাকা থেকে কমলা আনা এবং আপনাকে দেওয়ার মাঝে নির্বাণের কি সম্পর্ক রয়েছে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই। এখন ভন্তে বল্লেন,– শুনো তোমরা আমার জন্য ঢাকা থেকে কমলা আনতে হলে তোমাদেরকে কি করতে হবে তোমরা জাননা। ভন্তে, আমি বলি– এটা হলো রাজবন বিহার। রাজবন বিহার থেকে তোমাদেরকে রাঙ্গামাটি বাস ষ্টেশনে যেতে হবে এবং গাড়ীতে করে চট্টগ্রাম, তারপর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় গিয়ে কমলা কিনে আবার ঠিক একই পথে রাঙ্গামাটি এসে রাজবন বিহারে আসতে হবে। রাজবন বিহারে এসে বনভন্তেকে কিভাবে কমলা দিতে হবে আর কাউকে বলতে হবেনা। তোমাদের এ আসা যাওয়ার জন্য যে পথটি দেখালাম এটিই হচ্ছে সঠিক পথ। এই সঠিক পথটিই হচ্ছে বৌদ্ধ সাহিত্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা সঠিক পথ। বলতে গেলে 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'ই হলো নির্বাণের প্রথম সোপান। শুধু পড়লে হবে না, যারা গ্রহণ করতে পেরেছে তারাই নির্বাণ পথ গামী। আর যারা নির্বাণ পথগামী তাদেরকে আর বলতে হবেনা না নির্বাণ কি। সাধারণ কোন ব্যক্তি নির্বাণ কি তা বুঝবে না। কারণ যারা নির্বাণ পথগামী তারাই নির্বাণ চলে গেছে। নির্বাণ পথটি খুব সহজ নয়। তোমরা হয়তো আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কাহাকে বলে পড়েছো। কিন্তু সে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে তোমাদের জীবন গড়ে তোলা খুবই কঠিন ব্যাপার। বুদ্ধের বাণী উপদেশ শুধু মাত্র মুখস্ত করলে বা বই পড়ে মনে রাখলে কোন ফল হবেন না। এটা পালন করতে হবে, যারা পালন করতে পেরেছে তারাই শুধু জেনেছে এই ধর্মে কি আছে। আগত প্রফেসরগণ ছোট্ট শিশুর মতো ভন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। ভন্তের দেশনা বা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর শেষ করার সাথে সাথে তাঁরা একে অপরকে বলাবলি

করতে লাগলো, এ তো সাধারণ বৌদ্ধ ভিক্ষু নয়, তিনি স্বয়ং একজন মহাগুণী, মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ বটে। বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি বিশাল এবং জটিল প্রশ্নের উত্তর এত সহজভাবে একটি কমলার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এই মহাপুরুষ এখন আমাদের কাছে একটি গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। বনভন্তের প্রশান্ত ধ্যানোজ্জ্বল মূর্তি সহজ সরল সুমধুর প্রশ্নের উত্তর মুক্ত কণ্ঠের দেশনায় আগত প্রফেসর গণের মনকে আনন্দে অবির্ভূত করলো।

বাক্‌খালী বনভন্তের আগমন

প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যে ভরপুর চট্টলার ছোট্ট একটি বৌদ্ধ জনপদ বাক্‌খালী গ্রাম। গ্রামের ব্যক্তিত্ব মাষ্টার তরণীসেন বড়ুয়া, প্রয়াত বাবু নিহার কান্তি চৌধুরী, শ্রীমতি অন্‌জু প্রভা বড়ুয়া (সৃজনের মাতা), ডাঃ সুপ্রিয় চৌধুরী, বসুমিত্র বড়ুয়া, কমল কান্তি চৌধুরীর ঐকান্তিক উদ্যোগে মহান সাধক বনভন্তের পদার্পন ঘটে এই গ্রামে। পটিয়া পৌরসভার প্রায় এক কিলোমিটারের মধ্যে বাকখালী ঐতিহ্যবাহী প্রাতঃ স্মরণীয় বৌদ্ধ জনপদ। বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে সরু মেটো পথ দূর গ্রামের প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। গ্রামের দুই প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারে বর্ষাবাস যাপন করে ছিলেন বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ থেরবাদের অন্যতম প্রবর্তক মহাগুরু মহাত্মা পুর্ণাচার আচারিয়া চন্দ্রমোহন মহাস্থবির, সাধকপ্রবর প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, বাংলার কালজয়ী মহান কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির, নীরব সাধক অগ্রলংকার মহাস্থবির, বিনয়াচার্য বংশদ্বীপ মহাস্থবির সহ আরো অনেক বৌদ্ধ সাধক। গ্রাম থেকে বনভন্তেকে ফাং করতে যাওয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রাতঃ স্মরণীয় মহাপুরুষ গণের গ্রামে অবস্থানের কথা বনভন্তেকে বলার সাথে সাথে তিনি সাদরে তাদের ফাং গ্রহণ করলেন। বনভন্তের ফাং নেওয়া এবং আগমনের জয়ধ্বনির কলরব পড়ে গেলো সমগ্র এলাকাবাসীর মাঝে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত বৃন্দ সপ্তাহকাল আগে থেকেই প্রস্তুতি নিলেন বাক্‌খালী যাব বনভন্তেকে দর্শন করবো। পটিয়া হতে গ্রামের যাতায়াত পথ ভালো নয় বলে ভন্তেকে চেয়ারে বসে কাঁদে তুলে নিয়ে গেলেন বালক বৃদ্ধ গ্রামবাসী। শিল্পী প্রমোদ বড়ুয়ার সাজানো পদ্ম ফুলের আসনের মাঝখানে ভন্তে বসলেন। বনভন্তের আগমনে দূর-দূরান্ত থেকে আগত জনতার ভীড় বাক্‌খালী গ্রামকে জনমৌচাকের মত মথিত করে তুলল। সংঘদান শেষ হওয়ার পর পর

ভন্তে দেশনা শুরু করলেন। সঠিক বুদ্ধের পথ অনুসরণ করো, হিংসা-বিদ্বেষ মনোভাব ত্যাগ করো। অকুশল ও অশোভন আচারে কলঙ্কিত ব্যক্তি শুধু ভিক্ষাব্রত গ্রহণে ভিক্ষু হয় না। পরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ করলে ভিক্ষাব্রতী হওয়া যায় না। যিনি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, পাপপুণ্যকে অতিক্রম করেন এবং সর্ব বিষয়ে সজ্ঞান থাকেন, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। যারা পাপভয় শূন্য শ্রুতিজ্ঞানহীন আসল ভ্রান্ত তারাই হয় অসৎ ব্যক্তির মিত্র ও সহায়ক। একে বলা হয় অসৎ ব্যক্তি। অসৎ ব্যক্তি যে নিজের ক্ষতি কর বিষয় চিন্তা করে, পরের ক্ষতিকর বিষয় চিন্তা করে এবং উভয়ের ক্ষতিকর বিষয় চিন্তা করে, তা হল তার অসৎ চিন্তা। আত্মক্ষতিকর পরক্ষতিকর যন্ত্রণাই অসৎযন্ত্রণা। অসৎ ব্যক্তি যে মিথ্যা বলে, পিশুন বাক্য ব্যবহার করে, রূঢ়ভাষী হয় এবং নিরর্থক বাক্য বলে, তাতে সে হয় অসৎ বাক্য ভাষী। অসৎ ব্যক্তি যে প্রাণীহত্যা করে, চুরি করে ও ব্যভিচারী হয়, তা তার অসৎ কর্ম। অসৎ ব্যক্তির ধারনা জন্মের কোন মূল্য নেই। সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই, মাতা-পিতার কোন মূল্য নেই, সত্যিকার সাধু সজ্জন নেই, এ রকম ধারণাই অসৎ ব্যক্তির অসৎ দৃষ্টি। যারা নিজেকে ভালবাসে, প্রিয় বলে জানে, তারা দুস্কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। দুস্কর্ম করলে দুঃখই উদ্ভব হয়। মানুষের পরলোক গমনের সময় শুধু তার কৃতকর্মই তার অনুসরণ করে এবং তা নিজস্ব হয়। তাই পরলোকের কল্যাণের জন্য সর্বদা সৎকর্ম করা একান্ত উচিত। সৎসঙ্গ ও সৎ চিন্তা মানেই ব্রহ্মচর্য। সৎ সঙ্গের জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। সৎসঙ্গে মানুষের অপ্রমত্ততা আসে, চৈতন্যোদয় হয়। তা ইহলোকে ও পরলোকে সর্বত্র কল্যাণকর। তোমরা অকুশল কর্ম ত্যাগ কর, কুশল ধর্ম সম্পাদনে সৎকার্যে রত হও। বাক্‌খালী বৌদ্ধ বিহারের নীরব শান্ত পরিবেশে বন-ভন্তের ধর্ম দেশনা চলছে। ভক্ত ও নবাগতের সমাবেশে সভা পরিপূর্ণ। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দর্শনার্থীদের দানে ভন্তের সম্মুখ স্থান পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। উদ্যোক্তাদের মনে উৎকণ্ঠা লেগেই আছে। কারণ বনভন্তেকে আনার ব্যাপারে অনেকের অনীহা মনোভাব ছিলো। অনেক টাকার প্রয়োজন। ভন্তেকেও তেমন কোন দান দক্ষিণা দিতে পারেনি। গ্রামের অনেকে চাঁদা দিতে রাজি হলোনা, তারপরও উদ্যোক্তাদের মনে আনন্দ এই যে, অন্ততঃ বন ভন্তে এসেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, বনভন্তের উদ্দেশ্যে দেওয়া দান তিনি কিছুই সাথে নিয়ে গেলেন না। এমন কি থালা ভর্তি প্রচুর টাকা পর্যন্ত তিনি নিয়ে গেলেন

না, গ্রামবাসী তথা অনেকেই বন্দনা করে ভন্তের শিষ্যদের জানালেন ভন্তে এ দানীয় সামগ্রী এবং টাকা পয়সা যাহা আছে সব আপনাদের এই টাকাগুলো আপনারা নিয়ে যান। বনভন্তের শিষ্য উত্তরে জানালেন বনভন্তে কোন টাকা পয়সা গ্রহণ থেকে বিরত। এমনকি টাকা পয়সা সঙ্গে রাখাও নিষিদ্ধ, এ অনুরোধ আর কোনদিন করবেন না। সংঘ দানের দানীয় সকল সামগ্রী গ্রামের বিহারের জন্য দান করে গেলেন। বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র নিয়ম ভঙ্গও বনভন্তে সহ্য করেন না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের যে চিন্তা, সেই কাজ। কী চমৎকার! পুণ্যের পুরস্কার অদৃশ্য-শক্তি বলে মনে করেন। যেমন ঋদ্ধিমানের অচিন্তনীয় ঋদ্ধি-শক্তি!।

ড. শরনংকর ভিক্ষু বনভন্তের সান্নিধ্যে

চট্টগ্রাম জনবহুল শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার। বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাগণ এডভোকেট সুগত কান্তি বড়ুয়া, বাবু প্রিয়তোষ বড়ুয়া, বাবু পরিতোষ বড়ুয়া, বাবু শিশির কান্তি বড়ুয়া ও বাবু জিনাংসু বড়ুয়াসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ঐকান্তিক আহবানে ডক্টর শরণংকর ভিক্ষু চট্টগ্রাম সার্বজনীন বিহারে অবস্থান করেছিলেন। ডক্টর শরনংকর ভিক্ষু নেতৃত্বে বিহার কমিটির প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে জাক জমক পূর্ণভাবে স্থানীয় জে.এম.সেন হল প্রাঙ্গণে প্রথম অরহৎ পূজার নিয়ম প্রচলন হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি চট্টগ্রামের আপামর জন সাধারনের নিকট ধ্যান সমাধি পরিচালনা করার পর হঠাৎ একসময় সাধক প্রবর সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের সান্নিধ্যে গিয়ে উপনীত হলেন। বনভন্তেকে বললেন ভন্তে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য এসেছি। ১৯৮৯-৯০ সাল তখন সমগ্র চট্টগ্রামে চলছে সংঘরাজ নিকায়ে অষ্টম-নবম নিয়ে যুদ্ধ। অষ্টম সংঘরাজের জীবিত অবস্থায় তারই সামনে নবম সংঘরাজ নির্বাচিত করলেন নিকায়ের বিদ্রোহী ভিক্ষুরা। হিংসায় উন্মত্ত তখন গৃহী-ভিক্ষু বৌদ্ধ সমাজ। চঞ্চল, খুবই ক্লান্ত মনোভাবের নবীন ভিক্ষু ডক্টর শরণাংকরকে দেখে বনভন্তে বললেন, তুমি কেন এসেছো এখানে? ভিক্ষু শরনাংকরঃ ভন্তে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আপনার সান্নিধ্যে থাকতে চাই। বনভন্তে, না তুমি ফিরে যাও। আমার এখানে নিয়ম কানুন খুবই কঠিন। আমার এখানে আরাম করে থাকার কোন ব্যবস্থাও নেই। বিছানায় বালিশ দিতে পারবেনা, সারা রাত ঘুমুতে পারবেনা, গৃহি সমাজের সাথে তেমন আলাপ করার

সুযোগও নেই. ছাবাইক ব্যতীত আহার করার কোন ব্যবস্থাও নেই, এদিক ওদিক সাধারণের মতো গাড়ীতে চড়ে কোথাও যাওয়ার নিয়মও নেই, অন্যান্য ভিক্ষুদের ন্যায় চাকুরী করে টাকা রোজগার করে ব্যাংকে অর্থ জমানোর কোন সুযোগ বা নিয়মও নেই। এই বিহারের কোন ভিক্ষুকে টাকা দান করাও নিষিদ্ধ। কিছু দিন ভিক্ষু থেকে পরবর্তী চীবর ত্যাগ করে বিয়ে করে সংসার করবে এই ধরণের কোন ভিক্ষুর স্থান এখানে নেই। সুতরাং তুমি যেখান থেকে এসেছো সেইখানেই চলে যাও। শরণাংকর ভন্তে আমি আপনার সেই কঠিন নিয়ম পালন করতে পারবো। আমি চট্টগ্রামে অনেকদিন যাবৎ অনেক মানুষের মাঝে ধ্যান সমাধি দিয়েছি, ধ্যান পরিচালনা করেছি। বনভন্তে, ভাবনাচর্চার আগে তার পথ নিস্কণ্ঠক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এ সম্পর্কে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি আছে, সেগুলোকে প্রথমে দূর করতে হবে, নতুবা ভাবনা মূলেই বিঘ্নিত হবে। তুমি তা হয়তো করতে পারনি। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুদুর অগ্রসর হতে হবে। তাই জীবনের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্য শুদ্ধশীলের একান্ত কর্তব্য, সমাধির জন্য সচেষ্ট হও। শুধুমাত্র বই পড়ে বড় বড় ডিগ্রী নিলে মার্গফল লাভ করা যায় না। অনেকে বলে, আমি সব জানি, আমি সব পড়েছি, আমাকে ত্রিপিটক বিশারদ উপাধি দিয়েছে। ঐ সকল ব্যক্তিরা শুধুমাত্র জানা পড়া এবং বিশারদ নিয়ে থাকবে, আর বেশী দূর এগুনো সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মের লক্ষ্যবস্তু এর চেয়ে ভিন্ন। অতঃপর সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে ডক্টর শরনাংকর ভিক্ষু একান্ত হিতৈষী উপযুক্ত গুরুর নিকট কর্মস্থান সাধন কর্ম বা সাধন প্রণালী শুরু করলেন। ড. শরণাংকর ভিক্ষুর ভাবগত ও গুণগত সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় ছিলো।

ডক্টর শরণাংকর ভিক্ষুসহ অন্যান্য শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বনভন্তে আবার দেশনা করলেন, অকুশল পক্ষে রাগ যেমন স্নিগ্ধ কোমল, তেমনি শ্রদ্ধাও স্নিগ্ধ কোমল। রাগ যেমন কাম্য বিষয়কে চায়, তেমনি শ্রদ্ধা চায় শীলাদি গুণকে। আবার রাগ যেমন অহিতকে বর্জন করেনা, তেমনি শ্রদ্ধা বর্জন করেনা হিতকে। অকুশল পক্ষে দ্বেষ যেমন নিঃস্নেহ বা অননুরক্ত অর্থাৎ বিষয়ে অলগ্ন, তেমনি কুশল পক্ষে প্রজ্ঞা ও নিঃস্নেহ অননুরক্ত অর্থাৎ বিষয়ে অলগ্ন, দ্বেষ যেমন অযথা দোষ খুঁজে বেড়ায়, তেমনি প্রজ্ঞা যথাযথ দোষ অনুসন্ধান করে। দ্বেষ যেমন সত্ত্ব বা প্রাণীকে বর্জন করে, তেমনি প্রজ্ঞা বর্জন করে সংস্কারকে। মোহ যেমন অননুপ্রবেশের কারণে চঞ্চল,

তেমনি বিতর্ক লঘু পরিকল্পনের নিমিত্ত চঞ্চল। তাই মোহ চরিত, বিতর্ক চরিত্রের সজাতীয়।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেও মনের দুর্বলতা পরিহার করতে পারে না। কোন কোন ভিক্ষু সংযম শিক্ষা গ্রহণ করে না। এভাবে বনভন্তের আদর্শের অনুধ্যানে ভিক্ষুরা অনুপ্রাণিত হলেন এবং বনভন্তের আদর্শ অনুসরণ করে ডক্টর শরণাংকর ভিক্ষু রাজবন বিহারে বর্ষাবাস যাপন করতে লাগলেন। ১৯৯৮ সালের মে মাস প্রচন্ড শক্তিশালী জমরাজের দৃষ্টি পড়লো ডক্টর শরণাংকর ভিক্ষুর উপর। পূর্ব থেকে তেমন কোন অসুস্থ ছিলেন না তিনি। তারপরও ধরে নিতে হবে আমাদের জীবের জন্মলগ্নই লিপিবদ্ধ হয় মৃত্যুর পরোয়ানা। বললে অত্যুক্তি হবে না, সুস্থ স্বাভাবিক মনে কেউ মৃত্যু চায় না। মৃত্যুর নামে শিউরে উঠে মন। মৃত্যুকে সবাই ভয় করে। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কি রেহাই পায়? আকাশে সঞ্চরণ করো, নিঃসীম সমুদ্রে যাও অথবা পর্বতের নিভৃত বন্দরে থাক, কোথাও মৃত্যুকে এড়ানো যায় না। মৃত্যু আসবেই। শুধু মৃত্যুই কি একমাত্র বিভিষিকা জীবনে ? জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে আর কোন দুঃখ জ্বালা কি নেই? জন্মের হাত ধরে যেমনি আসে মৃত্যু, তেমনি আসে জীবনে জরা- বার্ধক্যের কঠিন আঘাত, দেহকে ভেঙ্গে-চুরে, রোগব্যাধির দুঃসহ যন্ত্রণা, শোকসন্তাপের দহন জ্বালা, নৈরাশ্য ক্ষোভের বেদনা ইত্যাদি অজস্র দুঃখরাশি। এক কথায় দুঃখের ভরা পসরা নিয়ে আসে জন্ম। সহজ কথায় বলতে গেলে জন্ম হয় বলে জীবকে দুঃখভার বহন করতে হয়। তাই কার্য কারণ প্রবাহে বলা হয়েছে জন্মের কারণে জরা মৃত্যু।

১৩ মে ১৯৯৮ সালের কথা। রাজবন বিহারের চার দিকে নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। হঠাৎ সাত সকালে ভিক্ষু শরণাংকর বন ভন্তের সম্মুখে গিয়ে বললেন, ভন্তে আমার শরীর খুবই খারাপ লাগছে। আমি কি একটু ডাক্তারের কাছে যাব? ঐদিকে চট্টগ্রাম থেকে ভন্তেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক এসেছে। ভন্তে আপনার অনুমতি পেলেই আমি ডাক্তারের কাছে যাবো। বনভন্তে শান্ত সমাহিত চিত্তে ডক্টর শরণাংকর ভিক্ষুকে দেখলেন, অল্প কিছুক্ষণ পর বললেন,- তুমি যাবে? আচ্ছা যাও,

কর্মফল শিকার করো, সংসারে অল্প আয়ু নিয়ে যখন এসেছো, তখন ভব-চক্রের কল্প কেটে যাও। বুদ্ধকে স্মরণ করো। বনভন্তের এই কথায় ভিক্ষু শরনাংকর হঠাৎ বিচলিত হলেন এবং বললেন আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আর কোন লাভ নেই। যেহেতু বনভন্তে বলেছেন আমি নাকি অল্প আয়ু নিয়ে সংসারে এসেছি। আমি আর বাঁচবোনা সকলের অনুরোধে গুরুকে বন্দনা করে বিদায় নিলেন ভিক্ষু শরনাংকর। শরণাংকর ভিক্ষুকে আনার জন্য যারা গেলেন তারাও বনভন্তের এই উক্তি শুনে কম্পিত হলেন। তারা ভিক্ষুকে চট্টগ্রামের কোন হাসপাতালে না নিয়ে সহসা ঢাকা সোহরোয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ১৫ মে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হাসপাতালেও ভিক্ষু প্রলাপ বকতে লাগলো যে- আমি আর বাঁচবো না, বনভন্তে বলেছেন আমার আয়ু শেষ হয়েছে। এভাবে প্রলাব বকা এবং বনভন্তের কথা বলতে বলতে ১৬ মে ১৯৯৮ ইংরেজী রাত্রেই তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হন। ১৭ মে তাঁর মরদেহ চট্টগ্রামে আনা হয়। কিছুক্ষণ মন্দিরে রাখার পর তাঁর গ্রামের বাড়ী বাগোয়ান বিহারেই নিয়ে গেলে সাথে সাথে বনভন্তের নির্দেশে প্রায় বিশ-ত্রিশ জন তাঁর সহকর্মী বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজবন বিহার থেকে এসে অষ্ট পরিস্কারসহ সংঘদান শেষ করে ডক্টর শরণাংকর ভিক্ষুর শেষকৃত্যানুষ্টান সম্পন্ন করা হয়।

ডক্টর শরণাংকর ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শেষ উপদেশ ও বাণী আজো সকলের হৃদয় কম্পিত করে।

বনভন্তে দেশনাস্থলে আগন্তুকদের প্রশ্ন

কঠিন চীবর দানোৎসবের মুখরিত পরিবেশ। চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে পুষ্প ও ধুপধুনার গন্ধে। জণাকীর্ণ সন্ধ্যা। দেশনালয়ে লোকে লোকারণ্য। শান্ত সমাহিত গম্ভীর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁর গম্ভীর ধ্যানদীপ্ত চেহারার মধ্যে এমন কি যেন ছিল, বালকবৃদ্ধ নির্বিশেষে সবারই ছিল তাঁর প্রতি ভয়মিশ্রিত ভক্তি। উপস্থিত জনতার মাঝে কেউ বৌদ্ধ, কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু। আগতদের মাঝে এক জনৈক ভদ্রলোক বনভন্তের সঙ্গে আলাপ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। বনভন্তে সম্মতি প্রদান করলেন। জনৈক ভদ্রলোক কালবিলম্ব না করে প্রশ্ন করলেন- রাম বনে যাবার সময় সীতাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, কিন্ত সিদ্ধার্থ বনে যাবার সময় গোপাকে সঙ্গে নিলেন না কেন?

বনভন্তে- রাম গিয়েছিল বনবাসে, আর সিদ্ধার্থ গিয়েছিলেন ধ্যান সাধনা করতে। গাট্টি কি জন্য নেবেন? (এখানে নারী লোককে গাট্টি বা বোঝা বলেছেন ভন্তে)।

জনৈক ভদ্রলোক,– গাট্টি কি?

বনভন্তে– এই তো আপনারা গাট্টি নিয়ে এসেছেন। তারা আপনাদের কথা না শুনে শুধু গল্প করছেন, তখন গাট্টির অর্থ বুঝতে পেরে ভদ্র মহিলারা বিরক্তি বোধ করে উঠে পড়ার জন্য সঙ্গীদের তাগিদ দিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকেরা ভন্তের সাথে আলাপ করার জন্য আগ্রহী হওয়ায় মহিলা সঙ্গীদেরকে বিহার এলাকায় ঘুরে দেখার জন্য বল্লেন। জনৈকের প্রশ্ন ঃ সিদ্ধার্থ বনে গিয়ে কি ধ্যান করেছিলেন?

বনভন্তে– কায় বিবেক, চিত্ত বিবেক ও উপাধি বিবেকই ছিল তাঁর ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য।

জনৈক ঃ এই শব্দগুলোর অর্থ কি?

বনভন্তে- কায় বিবেক হলো জনসঙ্গ বর্জন, অর্থাৎ লোকালয় বর্জিত স্থানে ধ্যান মগ্ন হওয়া। চিত্ত বিবেক হলো মানুষের চিত্ত সদা চঞ্চল ও অস্থির। স্বীয় অস্থির চিত্তকে অচঞ্চল ও স্থির করে ধ্যানে মনোনিবেশ করা। উপাধি বিবেক হচ্ছে চিত্তকে বিভিন্ন ক্লেশ হতে মুক্ত করে নির্বাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করা। এগুলো তত্ত্ব মূলক বিষয়।

জনৈক ঃ আচ্ছা নারী জাতি মুক্ত হতে পারেন কি?

বনভন্তে ঃ সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়ে তাঁর বিমাতা গৌতমীকে দীক্ষা দিয়ে মুক্ত বা অর্হৎ লাভ করিয়েছিলেন। গোপাও গৌতমী হতে দীক্ষা নিয়ে অর্হৎ লাভ করেছিলেন। বুদ্ধের সময়ে নারীও মুক্ত বা অর্হৎ হতে পারতো কিন্তু এখন সেরূপ উপযুক্ত পরিবেশ নেই।

জনৈক ঃ হযরত মোহাম্মদ আল্লাহর দূত, যীশু গড এর প্রেরিত পুত্র এবং যুগে যুগে ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার রূপে পৃথিবীতে এসে সৃষ্টি কর্তার ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ কে?

বনভন্তে ঃ গৌতম বুদ্ধ কারো দূতও নহেন, অবতারও নহেন। তিনি হলেন নির্বাণের আবিস্কারক। তিনি স্বয়ং মুক্ত হয়েছেন। তাই অপরকেও মুক্ত হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। তিনি মুক্তির পথ প্রদর্শক।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অলৌকিক কাহিনী

১৯৯৩ সালের কথা, রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের চীবর দান অনুষ্ঠান শেষ করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নগর বাসীকে ধর্মদেশনার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ যাত্রা করেন। তিনি জুরাছড়ি, সুবলং, দেওয়ানছর, নানিয়ারচর, বাঘাইছড়ি, গামারিঢালা, জীবঙ্গ ছড়া প্রর্ভতি বৌদ্ধ বিহারে প্রায় দুইমাস যাবত ধর্মদেশনা করবেন। একদিন জীবঙ্গছড়া বিহারে সার্বজনীন সংঘদান সমাপনের পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মদেশনা আরম্ভ করেন। সমাগত উপাসক-উপাসিকাগণ তখন দেশনা শুনে মগ্ন। ঠিক এমন সময় বিহার প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সজ্জিত মঞ্চের পাশে দেখা গেল এক বিশাল বিষধর সর্প। উপবিষ্ট উপাসক-উপাসিকারা সর্পের ভয়ে অন্যদিকে সরে যেতে শুরু করলো। তাৎক্ষণিকভাবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন তোমরা কেউ ভয় করবেনা, ভয় করবেনা, আগত সর্প তোমাদের কোন অনিষ্ট করবেনা। শ্রদ্ধেয় ভন্তে এভাবে বলার পর বিষধর সর্প ফনা তুলে কিছুক্ষণ ভন্তের অভিমুখে দাঁড়িয়ে জনতার মাঝে যাচ্ছিল। তখন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আবার সবাইকে বললেন, তোমরা তাকে একটু পথ দাও। তাকে (সাপ) যেতে দাও। দেখতে দেখতে উক্ত সর্প জনতার মাঝখান দিয়েই চলে গেল। পুনরায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন, অনেক সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্পরূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মদেশনা শুনতে আসেন। তোমরা কোন দিন এ ধরনের আগন্তুকের অনিষ্ট করবেনা।

মনুষ্য বেশে অপদেবতা

রাজবন বিহারে একসময় ভিক্ষু সংঘ মিলে মিশে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অজান্তে পালাক্রমে বিহার পাহারা দিতে শুরু করলো। একদিন রাত একটার সময় তিনজন শ্রামণ হাঁটতে হাঁটতে গেইটের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সামনের দিক থেকে দুইজন লোক আসতে দেখে তাঁরা উল্টো দিকে প্রস্থান শুরু করেন। আগত লোকগণ হঠাৎ দৌড়ে এসে একজন শ্রামণকে হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। অন্য দুইজন শ্রামণ তাঁকে রক্ষা করতে পারলো না। প্রায় ত্রিশ হাত টেনে নেয়ার পর হঠাৎ অপহৃত শ্রামণসহ লোকদ্বয় অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট গিয়ে ঘটনার কথা জানালেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বল্‌লেন,

যাও তোমরা গিয়ে বিশ্রাম কর। কিন্তু ভয়ে সারারাত তাঁদের ঘুম হয়নি। প্রতি দিনের নিয়ম অনুসারে ভোর চারটায় মাইকে সূত্র পাঠ করার পর শ্রামণ এসে বনভন্তেকে বন্দনা করতে দেখা গেল।

শ্রামণের এ ঘটনার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে বন বিহারে কমিটি সাবেক সহ-সভাপতি প্রয়াত বাবু জ্যোতির্ময় চাক্‌মা শ্রামণকে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রামণ ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, আমাকে যখন ধরে ফেলে তখন আমরা তিনজন অনেক শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের কাছে হেরে যাই। আমাকে ধরার কিছুক্ষণের মধ্যে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমাকে কোথায় নিয়ে গেলো, কোথায় ছিলাম তা' আমি কিছুই জানিনা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আবার আমার জ্ঞান আসে, তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি একটা ঘরে বসে আছি। সামনে একজন বৃদ্ধ লোক বলল শ্রামণ তুমি ভয় করো না। ভোর হলে তোমাকে বন বিহারে দিয়ে আসবো। বৃদ্ধের দুই যুবতী মেয়ে আছে। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ স্বরে তার মেয়েদের বল্‌ল তোরা আর জায়গা পাসনি বনভন্তের শ্রামণ নিয়ে এসেছিস্। তাদেরকে বকা-বকি করার পর আমার পাশে বসিয়ে রাখলেন। তাদের ভাষাও কথাগুলি অন্য ধরণের। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও আমি বুঝতে পেরেছি। মেয়েরা দূর থেকে তাদের বাবাকে বল্‌ল– আমরা শ্রামণকে বিয়ে করবো। বৃদ্ধ রাগ করে দা-খানা তাদের প্রতি ছুড়ে মারল। কিন্তু অল্পের জন্যে পড়েনি। কিছুক্ষণ পর বিহারে প্রতি দিনের ন্যায় সূত্র পাঠ শুরু হলো। শ্রদ্ধেয় ভন্তের মৈত্রী সূত্রের কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ আমাকে বল্‌ল– সূত্র পাঠ শেষ হওয়ার পর তোমাকে নিয়ে যাব। বৃদ্ধ আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে গেল আর আমি জানি না। শেষে বুঝতে পারলাম আমি রাজবন বিহারে হেঁটে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দিকে আসছি, তারপর ভন্তেকে বন্দনা করে আমার কক্ষে চলে আসি।

অতিথি ভিক্ষুদের প্রতি বনভন্তের উপদেশ

একদিন এক অতিথি ভিক্ষু রাজবন বিহারে আসেন। বিহারে এসে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে বন্দনার পর দেশনালয়ে বসে আছেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ভিক্ষু হয়েছ কত বৎসর হলো? উত্তরে জানালেন চার বৎসর। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে টেবিলের উপর কালির বোতল দেখিয়ে বল্‌লেন– এটা

কি কালি, আগত ভিক্ষুঃ জেম কালি, বনবন্তেঃ কোন দেশীয়? আগত ভিক্ষু- বাংলাদেশী। বনভন্তেঃ এটা কি কালি? আগত ভিক্ষু- হিরো কালি। বনভন্তেঃ কোন দেশীয়? আগত ভিক্ষুঃ চীন দেশীয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে– আচ্ছা বল দেখি এ হিরো কালি অন্য জায়গায় ঢেলে জেম কালি করা যায় কিনা? আগত ভিক্ষু- হ্যাঁ ভন্তে, রাখা যায়। বনভন্তে,– তাঁ হলে কেউ কি বুঝতে পারবে? আগত ভিক্ষু– বাহির থেকে কেউ বুঝতে পারবে না কিন্তু লিখলে বুঝতে পারবে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে, ঠিক তেমনি, কালির পেকেট হল রংপাত্র ও মুন্ডিত মস্তক এবং চিত্ত হল কালি। হিরো কালির প্যাকেট জেম কালী ওলট পালট করিও না। আচরণেই প্রকৃত ভিক্ষু ও ছদ্মবেশী ভিক্ষুর পরিচয় জানা যায়। প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন,- আজকাল রংবস্ত্র ও মস্তক মুন্ডিত করে কেন জান? ১। গরীব লোকের ছেলে ভিক্ষু হয়ে লেখা পড়া করার জন্য। ২। লেখা পড়া শিখে চাকুরী করার জন্য। ৩। বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ করে বিপুল অংকের টাকা রোজগারের জন্য। ৪। বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে নেতা হওয়ার জন্যে। ৫। ত্রিপিটক বিশারদ হওয়ার জন্যে। ৬। টাকা রোজগার করে ব্যাংক ব্যালেন্স করার জন্য। ৭। ছদ্মবেশে বিভিন্ন পাপ কার্য করার জন্যে। ৮। ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য। বর্তমান সমাজে অনেক ভিক্ষু- বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে চাকুরী করে টাকা রোজগার করে। আবার রাস্তায় নেমে মিছিল সমাবেশও করে। বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত। অমুক করবো তমুক করবো বলে দায়ক-দায়িকাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া। সমাজে বিভিন্ন অপকর্ম নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধরে আছে। তারাতো প্রকৃত ভিক্ষু নহে। তারা বুদ্ধের বিনয় বিরোধী। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একটি গাথা সুরে বলেন,–

শীলহীন ছদ্মবেশে ভিক্ষু হয়ে চলে,
পরকালে জ্বলে মনে নরক অনলে।
কাম রূপারূপ ত্যাগী হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু,
লভিবে নির্ব্বাণ সুখ আর জ্ঞান চক্ষু।

সাপছড়ি বনবিহার

সাপছড়ি পাহাড়ের চূড়ায় বনবিহারে বনভন্তের চার জন শিষ্য ধ্যান অনুশীলন করতেন। তাঁরা যথা সময়ে পাহাড়ের অদূরে পিণ্ডাচরণে যেতেন। পার্শ্ববর্তী পাড়ায় মাতাল কিছু দুষ্ট লোক অবস্থান করতেন। বনভন্তের

শিষ্যরা যখন সে পাড়া দিয়ে যেতেন তখন এক মাতাল লোক ভিক্ষুদের প্রতি সম্বোধন করতো 'কুকুরগুলি এসেছে'। এমন কি তাকে কেহ বাঁধা দিলেও সে আরো বেশী বলতো। এভাবে সে মাতাল লোকটি ভিক্ষুদের দেখার সাথে সাথে ব্যঙ্গ করে যা ইচ্ছে তাই বলতো। একদিন এক ব্যক্তির বাড়ীতে সূত্রপাঠের আয়োজন করলে বনভন্তে শিষ্যরা যখন সূত্রপাঠ শুরু করেন, তখন মাতাল ব্যক্তিটি নেচে নেচে বলতে লাগলো – 'কুকুর গুলি ডাকতেছে'। উক্ত কার্যকলাপে পাড়ার সকলে তার উপর ক্ষিপ্ত। কালক্রমে দেখা গেল ঐ মাতার ব্যক্তি হঠাৎ রোগাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সে প্রলাব বলতে শুরু করলো, আমাকে কুকুরে কামড়াচ্ছে'। কয়েকদিন যেতে না যেতে তার কোমড় অবশ হয়ে এলো। কিছুদিন পর তার স্বাভাবিক বাক্ শক্তি হারিয়ে এক পর্যায়ে কুকুরের মত ডাকতে শুরু করলো। ডাক্তার কোন রোগ ধরতে না পারায় এক পর্যায়ে সে বিনা চিকিৎসায় কুকুরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করলো।

প্রব্রজিতদের উদ্দেশ্যে গাথা সূরে পূজনীয় বনভন্তের দেশনা

এক সময় পরম পূজনীয় বনভন্তে রাজবন বিহারে তাঁর শিষ্য ভিক্ষুসংঘদের বলেন, একদা কিরণ মাষ্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ভন্তে, শাস্ত্রে যে উল্লেখ আছে যমদূতেরা পাপীদেরকে 'অমুকভাবে' 'সমুকভাবে' দুঃখ কষ্ট প্রদান করে থাকে তাহলে যমদূতদের কি পাপ হবে না? ভন্তে,– আমি তাকে বলেছিলাম, সে রকম নয়, যমদূত হল পাপীদের পাপকর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তারা তো কোন স্বত্ত্ব নয়। পাপীদের পূর্বজন্মের পাপকর্মের অনুসারে যমদূত উৎপন্ন হয়ে তাদেরকে বিবিধ প্রকারের দুঃখ কষ্ট প্রদান করতে থাকে। পাপীদের পূর্বজন্মের কর্মই তাদেরকে সেরূপ দুঃখকষ্ট প্রদান করে। আর একবার শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, ভন্তে, হিন্দুদের কথিত পুন্নাম নিরয় কি রকম? শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন;– আগে হিন্দু ধর্মীয় অনেক পুস্তক পড়েছিলাম কিন্তু বর্তমানে বুদ্ধ জ্ঞানে জেনেছি সেগুলো সবই কাল্পনিক। তাদের সাধনাগুলোও লৌকিক সাধনা, সেগুলো দ্বারা মুক্ত হওয়া যায় না। আমি রামকৃষ্ণ পরমংসকেও জ্ঞানযোগে অবলোকন করে থাকি। তিনি চতুর্থ ধ্যান লাভ করতঃ লৌকিক ঋদ্ধির অধিকারী হয়েছে মাত্র; দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। আর লৌকিক ঋদ্ধি দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে নিজেকে মহাজ্ঞানী,

মহাধ্যানী রূপে প্রচার করেছিল। চাক্‌মা জনসাধারনের মুখে উচ্চারিত ধ্যানী শিবচরণকেও আমি অবলোকন করে থাকি। শিবচরণও লৌকিক ঋদ্ধি লাভ করেছে মাত্র। তজ্জন্য তার গোজেন লামায় বলেছে– "না লাগিবে অন্নবস্ত্র, না লাগিবে শিলা বৃষ্টি আর"। ঋদ্ধির বলে সে স্বীয় ইচ্ছা মত– খাবার হতে শুরু করে সবই নিজে বানিয়ে ব্যবহার করতে পারে। সেই লৌকিক ঋদ্ধিকে মারের ঋদ্ধিও বলা চলে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির পথ তারা লাভ করতে পারেনি। লৌকিক ঋদ্ধি শেষ হয়ে গেলে সেও বিপদে পড়বে। সে আবার সাধারণ গৃহীকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ বিবিধ দুঃখ কষ্টের ভাগী হবে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তার শিষ্য ভিক্ষু সংঘদের বলেন, তোমরা বিবিধ আচার্য অনুসন্ধান করবে না, বিভিন্ন আচার্য অনুসন্ধানের ফলে নানা পথ নানা মতের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য তথাগতের উপদেশ হল "নানা জন্মের নানা রুচি পূর্ণ করা দুঃখজনক।" বিভিন্ন আচার্য অনুসন্ধানে সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ, এখন প্রব্রজিত আচার আচরণ এবং প্রব্রজিত শিক্ষাই গ্রহণ কর। প্রব্রজিত আচার-আচরণ কি রকম? কোন রমনীর সহিত ঠাট্টা-তামাশা, গৃহীসুলভ বাক্যালাপ না করা এবং রমনীর রূপে, রমনীর গন্ধে, রমনীর শব্দে মোহিত না হওয়া। শ্রদ্ধেয় ভন্তে তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা নারী চিত্ত হয়ে অবস্থান কর কি? খবরদার আমি তোমাদেরকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি, কখনো নারী চিত্ত হয়ে অবস্থান করবে না। নারী চিত্ত হয়ে অবস্থান করলে, নারীকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করলে, প্রব্রজিত জীবন বিসর্জন দিতে হবে। অজ্ঞানী পুরুষেরা সর্পরূপী নারীদের বিশ্বাস করে বিয়ে করে ফেলে। সাবধান,তোমরা সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হবেনা। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবার গাথা সুরে শিষ্যদের বলেন–

ওরে কাল সাপিনী, তোর মুখে ভরা বিষ,
কাল সাপ নিয়ে খেলছিস্, তুমি চিনতে তো না'রি?
ঢালছে বিষ দেখ, কাল সাপিনী ঐ,
জ্বলকে জ্বলকে বিষের ঢেউ
করছে রে থৈ থৈ।
সুধা বলে করছে রে পান, বিষে ভরা বাটি,
ও সুধা নয় রে, মোর হলাহল, ভুলে যাচ্ছে খাঁটি।
দেখবে তুমি একদিন এই কাজের ফলাফল।

তোমরা সর্বদা এ'কথাগুলো চিত্তের মধ্যে গেঁথে রাখবে। কখনো প্রলোভনের সম্মুখীন হলে এই সব কথা স্মরণ করতঃ চিত্তকে প্রলোভনের ফাঁদে পড়তে দেবে না।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, স্মৃতির মনস্থ করে মনে পড়ে আমার গৃহ কালীন সময়ের এক ঘটনার কথা। গ্রামের এক নারী স্বীয় স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে পর পুরুষের আসক্তি হয়েছিল। সেই পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তার নিজ স্বামীকে বিষয় প্রয়োগের মাধ্যমে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক রাত্রিতে সুযোগ বুঝে ঔষধের পরিবর্তে বিষ খাওয়ায়ে স্বামীকে মেরে ফেলে। আর সকাল হওয়ার একটু আগে লোক দেখানো বিলাপের সহিত কাঁদতে থাকতে এবং কলেরা রোগে তার স্বামী মারা গেছে এ কথা লোকদের বলে, সত্য ঘটনা লুকানোর চেষ্টা করে। রাত্রি প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে লোকজন জড়ো হতে লাগলো। ইত্যবসরে একজন ব্যক্তি লক্ষ্য করল, ঐ নারী কান্না করছে অথচ চোখ থেকে কোন অশ্রু বিগলিত হচ্ছে না। ব্যাপারটি সে একে একে সবাইকে জানালে সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে, এটা কেমন ব্যাপার। এইভাবে শেষমেষ সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। শ্রদ্ধেয় ভন্তে আরো বলেন,– আমি গৃহীকালীন সময়ে এইরূপ একটি নাটকের দৃশ্যও দেখেছি। নাটকে বিবেকের সুরটি শ্রদ্ধেয় ভন্তে তাঁর শিষ্যদের বলেন–

কাঁদলে কি হবে, চোখে নাই তোর জল,
ঐ দেখ না চেয়ে দু'চোখ বেয়ে
কেবল বের হয়েছে অনল।

হে ভিক্ষুগণ, কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে নারীকে বিয়ে করার চিন্তা করবে না। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, যাদের মাথায় এ ধরণের চিন্তা চেপে বসে আছে তারা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সার-অসার, কিছু বুঝতে পারে না। তাই তো বলি–

হায়রে পাপমতি মার ঘাঁড়ে চাপে যার,
বিবেক বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি সেসব ছেড়ে যায় রে তার।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন– একবার এক উপাসিকা স্বামীর মৃত্যুতে শোকাহত অবস্থায় একটু শান্তির আশায় আমার কাছে আসে। ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাকে বলতে থাকে, ভন্তে, আমি খাওয়া দাওয়া সব

পরিত্যাগকরে মরে যাবো। এত দুঃখ আর সহ্য হচ্ছে না। আমার অন্তর দুঃখের আগুণে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমি বাঁচতে চাই না। এই বলে ক্রন্দনের বেগ সামলাতে না পেরে মাথা নিচু করতঃ কাঁদতে থাকে। তখন আমি সেই উপাসিকাকে একটি উপদেশ দিয়েছিলাম–

আঁধার আলোকে গঠিত বিশ্ব
দুঃখের পরে মাগো সুখের নিশি।
মোছ মা মোছ মা নয়নের ধারা,
ওই আসে দেখ প্রভাতের হাসি।
আবার আসিবে সে সুখ নিশাটি।
বাজায়ে মধুর বীণাটি,
ধৈর্য্য বাঁধনে বাঁধো মা পরাণ,
ডাকো না তাহারে সেরূপে ভাসি॥

এই উপদেশটি শুনে উপাসিকা মনের মধ্যে শান্তি লাভকরে। অবশেষে সে দুই হাত জোড় করে আরো কিছুক্ষণ ধর্মদেশনা শ্রবণ করার পর আমার জন্য স্নানের জল এনে দেয়। শ্রদ্ধেয় ভন্তে ভিক্ষু সংঘদের এই ভাবে উপদেশ দেওয়ার সময় হঠাৎ এক উপাসক তার পারিবারিক অশান্তিতে উদ্বিগ্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে বনভন্তে তার অশান্তির খবরা খবর নিতে গিয়ে বলেন– তোমার স্ত্রী এখনো আগের মতন ক্ষ্যাপে আছে কি? আচ্ছা, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে এই কথাটি গাথা সুরে বলো–

ছিঃ ছি! ললনা, কুলের অঙ্গনা,
স্বামী বধে কেন তুমি বাসনা,
রমনীর গতি পতির চরণ,
যাচিব মরণ কামনা।
আঁধার জীবনে চিনে গো আলো,
নেহারী জীবনে হৃদয়ে ভুলো;
মিলনে মধুর যোজনা।
ছি! ছি! ললনা, কুলের অঙ্গনা,
স্বামী বধে কেন তুমি বাসনা,
পরশনে যায় স্বীয় স্বীয় তাই,
চির বিকশিত বদন সদায়।

নারী জন্মে সার ভালোবাসে যায়,
বিলায়ে দিয়ে, তুমি কেন আপনা।

(উল্লেখ্য এই উপাসককে নাকি তার স্ত্রী দা দিয়ে কোপ দিতে উদ্যত হয়েছিল) তোমার স্ত্রী যদি এটি যথার্থ বুঝতে পারে, তাহলে তোমাকে আর দা দিয়ে কোপ মারতে চাইবে না। তোমাদের বিবাদ মিঠেও যেতে পারে। আবার স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয় তাহলে তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) এরূপ বলতে পারো।

সম্বল চরণ ওহে বীরবর,
অবলায়ে প্রাণে মেরো না।
বর বিহঙ্গীনি সফলা সখিনী,
কি দোষে বাধবে বলো না।
ব্যাথা তার কাঁধে নিয়ে, মাথায় বোঝা নিয়ে,
ভ্রমি বনে, বনে, কতো যাতনা সহে
কেন ব্যথিত বেদনা তুমি বোঝ না।

স্বামী স্ত্রী চিরদিন পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের সাথী থাকার শপথ গ্রহণ করেছিল। প্রেম ভালবাসায় একসাথে চলার দৃপ্ত প্রত্যয়ী হয়েছিল। বিয়ে করার আগে কতো মধুর সুরে মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু বিয়ে করার পর সেসব আর কিছুই থাকেনা। এসব থেকে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর। কাজেই তোমরা সকলে দৃঢ়ভাবে নির্বাণের উপদেশ শ্রবণ ও নির্বাণ লাভের চিত্ত হয়ে অবস্থান কর। নির্বাণ ছাড়া আর কোন কিছুর স্থান তোমাদের চিত্তে যেন না আসে। তোমরা সকলে নির্বাণ সুখ লাভের অধিকারী হও। (উক্ত দেশনার উল্লেখযোগ্য অংশটুকু শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু সংকলিত আর্য্য শ্রাবক বনভন্তের ধর্ম-দেশনা সিরিজ-৩ থেকে সংকলন করা হলো।)

বনভন্তের সান্নিধ্যে বিচারপতি হাবিবুর রহমান

(১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা)

সত্যের সন্ধানে সংসার ত্যাগী আর্য্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে এসেছিলেন দেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহামান্য বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব। ২০০১ সালের কথা। পূর্বে থেকে জানা ছিলো ১৪ জুন,

রোজ শনিবার মহামান্য বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব রাজবন বিহারে আসবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকাল সাড়ে আটটায় বিচারপতির সাদা রং-এর পাজেরো গাড়িটি নিয়ে সহসা রাজবন বিহার প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলো। সাদা রং এর পোশাক পরিহিত হালকা পাতলা, লম্বা, লাবন্য দ্বীপ্ত চেহারার অধিকারী স্বনামধন্য ব্যক্তিটি গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে অপেক্ষমান উপাসক উপাসিকা ও পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রথমে। তারপর এদিক ওদিক না গিয়ে সোজা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিশ্রামালয়ে চলে গেলেন। পূজনীয় ভন্তের সাথে মান্যবর অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেবকে পরিচয় করে দেন পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা। পরিচয় শেষে যথারীতি মান্যবর বিচারপতি মহোদয়সহ আগত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নির্ধারিত আসনে (ফ্লোরের উপর কাপড় বিছানো স্থানে) উপবেশন করলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিচারপতির সাথে কুশল বিনিময়ে এক পর্যায়ে বলেন– আপনার বাড়ী কোথায়? বিচারপতি বললেন, আমি ঢাকায় থাকি। বনভন্তে- সেটা তো জানি, আপনার জন্ম স্থান (আসল বাড়ী) জানতে চেয়েছিলাম। বিচারপতি, ও হ্যাঁ, আমার নিজ বাড়ী রাজশাহীতে।

বিচারপতি মহোদয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, এ পৃথিবীতে মানুষ অল্প দিনই বেঁচে থাকেন, তাই জ্ঞানীজনেরা সর্বদা অপ্রমাদের (সতর্কতার) সহিত পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে। আর যারা মূর্খ, বুঝেনা তারা সর্বদায় পাপ কর্ম সম্পাদন করতঃ ইহ জীবন ও পর জীবনকে দুঃখময় করে তোলে। যেমন এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় থাকাকালীন স্বেচ্ছাচারিতা শাসন কায়েম করে জনগণের কাছে নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য হয়ে বর্তমান দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করছে।

আসল কথা হল, প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি হলে অনেকে ক্ষমতাবান মনে করে, ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যায়। কারো নিকট সৎ উপদেশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে চায় না। কিন্তু ক্ষমতাবান হলে আরো বেশী সিদ্ধপুরুষ, সৎ পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের সৎ উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। এতে নিজের ও দেশের জন্য উত্তম মঙ্গল সাধিত হয়। আমেরিকা, তথা বিশ্বের অনেক স্বনামধম্য ব্যক্তি এখানে এসেছিলো, সাক্ষাৎ ও সৎ পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য। এ'গুলো হল পণ্ডিত ব্যক্তির কাজ।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে কেবল মাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তবে বেগম খালেদা জিয়াও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল, আর এরশাদ সাহেবও স্বীয় শাসনের একেবারে শেষের দিকে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে তা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। আমি বলি কি– শেখ সাহেব যদি দেশ স্বাধীন করার পর আমার সাথে সাক্ষাৎ করতঃ দেশ পরিচালনার জন্য সৎ উপদেশ, সুপরামর্শ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করতো তাহলে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হতো। অন্ততঃ তাকেও করুণ পরিস্থিতির শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হতো না। বনভন্তে সাথে সাথে মহাত্মা গান্ধীর কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা খুব বেশী পরনির্ভরশীল হয়ে দেশ পরিচালনা করে থাকে। তারা কোন্ কাজ করলে দেশের জন্য ভাল হবে আর কোন্ কাজ করলে দেশের জন্য অমঙ্গল হবে সেটা নির্ণয় করতে পারে না। তাই দেশের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে বেশী। তাদের যদি দেশের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে পরিস্কার ধারনা থাকত তবে কি এরূপ অবস্থা চলতে পারত? কখনো না। ভালো-মন্দ সম্বন্ধে যথাযথ ধারনা এবং মন্দকে বাদ দিয়ে ভালটা বেচে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান শক্তির। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এটা ভালো, এটা মন্দ, এটা ন্যায়, এটা অন্যায়, এটা সত্য, এটা মিথ্যা বলে কাজের বিচার করতে সক্ষম হয়। মানুষ অজ্ঞতা বশত কতো অন্যায়, কতো অপরাধ, কতো ভুল, কতো গলদ করে তার অন্ত নেই। ফলে সেই অন্যায়, অপরাধ, ভুল কাজের জন্য তাদেরকে বারবার শাস্তি ভোগ করতে হয়।

বনভন্তে আরো বলেন, কোন কাজ ভাল আর কোন কাজ মন্দ এটা জানা সাধারণ লোকের বোধগম্য বিষয় নয়। যারা অজ্ঞানী মূর্খ তারা ভালোকে মন্দ বলে, মন্দকে ভালো বলে, ন্যায়কে অন্যায় বলে, অন্যায়কে ন্যায় বলে, নির্দোষকে দোষ বলে, দোষকে নির্দোষ বলে। বুদ্ধ বলেছেন- মুর্খ ব্যক্তিদের এই ছয়টি দোষ বিদ্যমান থাকে। তারা সব সময় এইভাবে উল্টোপাল্টা কাজ করে থাকে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এ কথা বলার পর প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে

আবার বলেন, মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্বাক্য ভাষণকারী, দুষ্কর্মকারী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি মূর্খ আর সমুক ব্যক্তি পণ্ডিত তাদেরকে জানার, চিনার উপায় কি? কিভাবেই বা জানবে সে এই ব্যক্তি মূর্খ আর এই ব্যক্তি পণ্ডিত? বুদ্ধ বলেছেন– কর্মই মূর্খের লক্ষণ, কর্মই পণ্ডিতের লক্ষণ। তাদের স্বীয় আচরিত কর্মের দ্বারাই জানা যায় যে তারা মূর্খ, নাকি পণ্ডিত। মূর্খ ব্যক্তিরা দুশ্চিন্তা করে, দুর্বাক্য ব্যবহার করে এবং দুস্কর্ম সম্পাদন করে। এসব খারাপ কার্যের দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তি মূর্খ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সুচিন্তা করে, সুবাক্য বলে এবং সুকর্ম সম্পাদন করে। এ'সব ভালো কার্য্যের দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তি পণ্ডিত। আপনিও সব সময় সুচিন্তা করবেন, সুবাক্য বলবেন, সকর্ম সম্পাদন করবেন। কখনো দুশ্চিন্তা করবেন না, দুর্বাক্য বলবেন না এবং দুষ্কর্ম সম্পাদন করবেন না। পূজনীয় ভন্তে এরূপ বললে বিচারপতি মহোদয় সহাস্য মুখে মাথা নেড়ে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন– আপনি তো প্রধান বিচারপতি ছিলেন। হ্যাঁ ছিলাম। কিছুদিন আগে অন্য আরেকজন বিচারপতি আমার নিকট দেখা করতে এসেছিলেন। আপনারা বিচার করেন বলে বিচারপতি। সেই বিচার কি? ভালো-মন্দ সম্বন্ধে বিচার, দোষ-নির্দোষ সম্বন্ধে বিচার, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বিচার। বিচার-পতিদেরকে সেই ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বিচার করে ভালো এবং ন্যায়ের দিকে রায় দিতে হয়। এখন বিচারপতিরা যদি ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো, দোষকে নির্দোষ, নির্দোষকে দোষ, ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বলে বিচার করেন বা রায় দেন তাহলে সেটা সুষ্ঠু বিচার হবে কি? হবে না। আবার, আসামী কি সত্যিই অপরাধী? নাকি নিরপরাধ ব্যক্তি বা কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার এ দশা হয়েছে এসব বিচার করা সহজ কথা নয়। মিথ্যা সাক্ষীর জন্য এবং সাক্ষী প্রমাণের অভাবে নিরাপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করলেতো আইনের চোখে সঠিক হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ভুল বিচারই করা হবে। অন্যদিকে, একই যুক্তিতে দোষী ব্যক্তিকে নিরপরাধী বলে বেকসুর খালাসের রায় দিলে তাও ভুল বিচারই করা হবে।

বর্তমানে অজস্র ভুল বিচার করা হচ্ছে দেশের অনেক স্থানে। তাই বলি, বিচারপতি হওয়া সহজ নয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল থাকলে নিজকে অনেক ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে রাখা সম্ভব হতে পারে। এভাবে বনভন্তে দেশের আরো কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের কথা বিচারপতি মহোদয়কে বলেন,

এরপর বিচারপতি হাবিবুর রহমান উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, আমার তথা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করবেন। আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এবার আসি বলে হাত উঠিয়ে সালাম প্রদান করেন।

(লেখাটি শ্রীমৎ চন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু সংকলিত আর্য্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা সিরিজ-২ থেকে সংকলিত)

প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশনা

আজ শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। ২৮শে সেপ্টেম্বর '৯৩ ইংরেজী রাজবন বিহারে সংঘদান, অষ্ট পরিস্কার দান ও বুদ্ধ পূজা সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এক সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি বিবিধ নেতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

আত্মাবাদী নেতা অত্যন্ত অহংকারী হয়। তারা মুখে জগত উদ্ধার করে। কিন্তু কাজের বেলায় কিছু নয়। তারা মৃত্যুর পর চার অপায়ে পতিত হয়।কথা আর কাজে মিল নেই বলে তাদের পরিণত অধোপাতে।

দেব নেতা ও মনুষ্য নেতা ধ্বংস হয়। পদ্ম যেমন কর্দম হতে উপরে উঠে শোভা বর্ধন করে তেমনি জ্ঞানবলে দেবনেতা ও মনুষ্য নেতাও চারিআর্য সত্য জ্ঞানে উপরে উঠে বা নির্বাণ লাভ করে। তাহলে বুঝতে হবে জ্ঞান বলে উচ্চ নেতা হওয়া যায়। পৃথিবীতে যত প্রকার নেতা আছে তাদের পতনের আশংকা থাকে।

বিদর্শন পুদ্গল সাধারণ চোখে দেখা যায় না। যে বুদ্ধ ও ধর্মকে দেখেছেন তিনি চারি আর্য্য সত্যকেও দেখেছেন। যে চারি আর্য্য সত্যকে দেখেছেন তিনি বুদ্ধ ও ধর্মকে দেখেছেন। একই কথা একই অর্থ। তাহলে যথার্থ দর্শন করা প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দুঃশীল ভিক্ষুদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন- আজকাল প্রকৃত ভিক্ষু চেনা মহা কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে। যেমন পূর্বকালে একটা বানর সিংহের চর্ম পড়ে ধান খেয়েছিল। সে এলাকার সবাই ভয়ে তাড়াতো না। তাদের মধ্যে জনৈক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তা করল সিংহ কোনদিন ধান খায় না। সুতরাং লাঠি হাতে যাওয়ায় বানর সিংহ চর্ম ফেলে চলে যায়। সেরূপ বর্তমানে কিছু সংখ্যক নামধারী ও ছদ্মবেশী ভিক্ষু কাষায় বস্ত্র পরিধান ও মস্তক মুন্ডন করে সংঘের বেশ ধারণ করেছে। তাতে সংগের আবিলতা ও সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

বর্তমানে ঐ ধরনের বেশধারী ভিক্ষুরা ধর্মের নামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, গোয়েন্দাগিরি, ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজের নানাবিধ কর্মে সারাক্ষণ নিয়োজিত থাকে। এগুলির কারণে নানারকম গণ্ডগোল ও অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি বলেন– ভগবান বুদ্ধ বলেছেন হে ভিক্ষু, তুমি ভব সাগর পার হও, মুক্ত হও এবং অপরকে পার করতে চেষ্টা কর। জ্ঞান-পুণ্যে মানুষ মুক্ত হয়। অজ্ঞান-মিথ্যায় মানুষ অপায়ে পতিত হয়। অজ্ঞান-মিথ্যা হতে সর্ব-দুঃখের উৎপত্তি।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- ভিক্ষু হলো সুদক্ষ মাঝি বা চালক। উপাসক-উপাসিকা হলো আরোহী। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অথবা রাস্তার পাশে গাছের সহিত ধাক্কা লাগায়। গাছের সহিত ধাক্কা লাগা কি জান? সেটা হলো নারীর সংস্পর্শে যাওয়া। একথা তিনি বলায় আমরা সবাই হেসে উঠি।

এগুলি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রথমেই নির্বাণের শিক্ষা করতে হবে, নির্বাণের অভ্যাস করতে হবে, নির্বাণের উপদেশ গ্রহণ করতে হবে এবং নির্বাণের জ্ঞান অধিগত করতে হবে। অন্য শিক্ষা, অন্য অভ্যাস, অন্য উপদেশ এবং অন্যান্য জ্ঞানে মানুষ অপায়ে পতিত হয় সেখানে নানা প্রকার দোষ বিদ্যমান থাকে।

তিনি বলেন– বনভন্তের গুরু নেই। উচ্চ ও উদার মন হওয়া প্রত্যেকের উচিত। নীচু, খাটো ও মায়াবী মন গোপনে গোপনে পাপ করে অপায়ে পতিত হয়। কেউ কেউ পাপ করে স্বীকার করে। তাদের পাপ ক্ষয় হবে। চিকিৎসক রোগীর অবস্থা জেনে যেভাবে রোগ নিরাময় করে ঠিক সেভাবে বনভন্তেও তোমাদের ক্লেশ রূপ চিকিৎসা করে থাকেন। যতক্ষণ চারি আর্যসত্য দর্শন বা অধিহত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কথন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন প্রকাশন ও ঘোষণা করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন– আজকাল প্রায়ই এম. এ. পাশ বা যে কোন ভিক্ষু ভিক্ষুজীবন ত্যাগ করে সংসার জীবন পালন করে। তাদের সমালোচনা করে বলেন– যেমন ধর, সমাজে এমন কোন লোক যদি এম.এ. পাশ করে (গৃহী) তাদের উপযুক্ততা যাচাই না করে মেথরের মেয়ে বা নিকৃষ্টতম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে অসম বিয়ে করে সমাজে নিন্দনীয় হয়। ঠিক সেরূপ যারা ভিক্ষুত্ব জীবন ত্যাগ করে সংসার জীবন যাপন করে তারাও

মেথরের মেয়ে বিয়ে করার মত অবস্থার সামিল হয় বলে উপমা করা যায়।

তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন– ভিক্ষুরও বিয়ে আছে। সে বিয়ে কি রকম জান? সে বিয়ে হলো নবলোকত্তর ধর্মরূপ বিয়ে করা। ভিক্ষুর উপযুক্ত বিয়ে হলে ভগবান বুদ্ধেরও প্রশংসা অর্জন করে থাকে। তিনি আরও উপমা দিয়ে বলেন– রাজপুত্র যেমন তার উপযুক্ত রাজকন্যা বিয়ে করে ঠিক তেমন ভিক্ষুরও তার উপযুক্ত বিয়ে নবলোকত্তর ধর্ম। এদিকে ভোজনের সময় হলে তিনি আপাততঃ ধর্মদেশনা স্থগিত করেন।

বিকালের ধর্মদেশনায় তিনি বলেন– ধর্ম শ্রবণে শ্রুত ও অশ্রুত বিষয় নিয়ে নানাজনে নানা প্রকার ধর্মকথা ভাষণ দিয়ে থাকেন। যেখানে চারি আর্য সত্য নেই সেখানে সংশোধন বা উত্থাপন করাও উচিত নয়। চারি আর্য সত্য শুনে দর্শনে, জেনে ও বুঝে তাতে বিপুল পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং সুখ হয়। যদি না শুনে, দর্শন না করে, না জেনেও না বুঝে তাতে পরকালে চারি অপায়ে পতিত হয় এবং মহা দুঃখের অধিকারী হয়।

তিনি বলেন- লেখাপড়া করে কেন জান? বড় চাকুরী করার জন্যে, বেশী টাকা উপার্জন করার জন্যে এবং সংসারের যাবতীয় সুখ ভোগ করার জন্যে। কিন্তু সুখ ত্যাগ ও ভোগ ত্যাগ করা মহা কঠিন ব্যাপার। সুখ ভোগ ত্যাগ করলে লোভ, দ্বেষ, মোহ বা অজ্ঞান মুক্ত হতে পারে।

অসুখের পরে মুখের স্বাদ তিক্ত লাগে। ঠিক সেরূপ লোভ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত মানুষের নির্বাণের কথা ভাল লাগবে না। বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধকে অনেকে গালি দিয়েছে। আমাকেও সেরূপ গালি দেয়। মানুষ অসাধু সাধু হয় এবং সাধু ও অসাধু হয়। যেমন অঙ্গুলীমালা বুদ্ধের সংস্পর্শে সাধু হয়েছেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের সংস্পর্শে অসাধু হয়েছেন। ভাল-মন্দ মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু ভাল ও একদিন থাকে না মন্দও একদিন থাকে না। যেমন শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে পৌঢ় এবং পৌঢ় থেকে বৃদ্ধকাল। সেখানে আছে শুধু অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম। কেউ কেউ নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে ধর্ম দেশনা করেন। অন্যান্য জন অনুমান বা আন্দাজ করে ধর্ম দেশনা করেন। কেউ কেউ বলে থাকে বনভন্তে সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়েছেন কিনা? পরোক্ষভাবে তিনি বলেন– মানুষ সারা রাতদিন আলাপে ও নানাকাজে ব্যস্ত থাকলে কখন তার জন্যে নির্বাণ? শাক্য বংশ ধ্বংস কিভাবে হয়েছে তা ব্যক্ত করে বলেন– কামাসক্ত ব্যক্তি হঠাৎ অপায়ে

পতিত হয়। পূর্ব জন্মে পাপ করলে ইহজন্মে মহাকষ্ট পায়। পূর্বজন্মে পুণ্য করলে ইহজন্মে সুখ পায়। পুরুষ ব্যভিচার করলে নারী জন্ম হয়। নারী ব্যভিচার করলে নরকে পড়ে। মানুষের সুপ্ত দুঃখ আছে কিন্তু যুক্তি বুদ্ধি ও মুক্তির পথে চললে নিশ্চয়ই মুক্তি পেতে পারে।

তোমরা পুণ্য ও সুখ জমা কর। ক্রমান্বয়ে তোমাদের জ্ঞান কুম্ভ পূর্ণ হবে। শিক্ষক যেমন ছাত্রকে তিরস্কার করে ও শাস্তি প্রদান করে ঠিক তেমন বনভন্তেও তোমাদেরকে তিরস্কার করে। পরকাল বিশ্বাস করে পূণ্যকর্ম কর। ফল অবশ্যই পাবে। ভিক্ষু সংঘ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ হও। উপাসক-উপাসিকা শীলবান শীলবতী হও। জন্ম মৃত্যু দীপশিখার মত। পৃথিবীতে মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ আপন নয়। যারা জ্ঞানী তারা আপনজন বলতে কাউকে মনে করেন না। তাদের আপনজন হলো শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। পুণ্যে পুরস্কার পায় এবং পাপে শাস্তি পায়।

তিনি আরও বলেন- সংসারে চার প্রকার মানুষ আছে কেউ কেউ মুখে শুধু বলে কাজে পরিনত করে না। কেউ কেউ কাজে করে মুখে বলে না। কেউ কেউ মুখও বলেনা কাজেও করে না। কেউ কেউ মুখেও বলে কাজেও করে। এগুলো হলো কাজ কথা পরিচয়। কেউ কেউ দুঃখে পড়ে কাঁদে আর সুখে হাসির অন্ত থাকে না কিন্তু জ্ঞানীরা হাসিকান্না করেন না। তোমরা স্বাবলম্বন হও। অপরের প্রতিপালন হইও না। পাপ জমা করিও না। পুণ্য জমা কর। চারি আর্যসত্যকে বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস ও কর্মফলকে বিশ্বাস কর। তিনি ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে উদয় ব্যয় ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা বিদর্শনে যাওয়ার আগে উদয় ব্যয় ভাবনা ধ্যানীর পক্ষে খুবই সহায়ক। উদয় ব্যয় ভাবনায় অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

তিনি সুখ সম্বন্ধে বলেন– বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগে সুখ ও দয়ায় সুখ। একদিকে ত্যাগে সুখ কি রকম? অবিদ্যা ত্যাগ করতে হবে, তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে এবং উপাদান ত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে দয়ায় সুখ কি রকম? সর্বজীবে দয়া করতে হবে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণী হতে বৃহত্তর প্রাণী পর্যন্ত মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে হবে। তাতেই চিত্তের মধ্যে নেমে আসবে অনাবিল ও পরম সুখ।

উপসংহারে উপমাস্বরূপ তিনি বলেন– মেঘ যেমন পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। যার প্রয়োজন তার সাধ্যানুযায়ী পাত্রে জল ধারণ করে ঠিক বনভন্তেও মেঘরূপ দর্শদেশনা প্রদান করে থাকেন। তা হতে উপাসক উপাসিকারা সাধ্যানুযায়ী ধর্ম ধারণ কর। এ ভাষণে তিনি ধর্মদেশনার ইতি টানলেন।

বনভন্তে

শিল্পী শাক্যমিত্র বড়ুয়া

ভরা পূর্ণিমা চন্দ্র আলোয় আলোকিত, চারিদিক
উদ্‌ভাসিত
শুভ্র বসনায় আবৃত বন পরিবেশ॥
পাহাড়ে হেলান দিয়ে বনদেবতা, অবাক নয়নে
চেয়ে রয়,
পাহাড়ের কোল ঘেষে ছোট্ট একটি মাচা ঘর
মায়ের কোলে মিট্ মিট্ চোখে, খিল, খিল
করে হাসে, মায়ের স্নেহের পরশে,
জননীর বুকের দুধ পান করে ঘুমায় শুধু ঘুমায় ॥
ঘুমন্ত যাদু বুকে ধরে, যতন করে রাখে,
বাঁশের তৈরী শয্যায়,
ধীরে ধীরে, বড় হয়, শিশু, কিশোর এবং
যৌবনের পদার্পন ॥
পাহাড়ীয়া মন, সহজ, সরল, উদার, মনে নাই
কোন কালিমা,
হৃদয় মানতে লাগেনি কখনও আলকাতরা,
উদাস মনে কি যেনভাবে, বসে নিরালায় বৃক্ষ তলায়,
প্রাণী জগতের দুঃখ দেখে, জেগে উঠে শান্তি শিখা,
ত্যাগী জীবন, ত্যাগী মন কেতারে ধরিয়া রাখিবে,
সে যে বুদ্ধ পূজারী, জগঃজ্যোতির
নয়নের নয়ন ॥
"সাধনানন্দ ভিক্ষু" "বনভন্তে" মাটিতে তার আসন,
কেউ পারেনি, আমিও পারেনি দিতে তাঁরে
স্বর্ণ সিংহাসন।

বিদর্শন ভাবনা, তাঁর প্রতিটি নিশ্বাসে জেগে রয়
'আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে' বিচরণ যার
শুধু বন্দনা ছাড়া কি আছে আমার, দেবো তারে!
হিমালয় হতে নৈরঞ্জনা নদী কূলে
ভগবান বুদ্ধের গয়া ধাম,
গয়াধাম হতে বাংলাদেশ, রাংগামাটি
রাজবাড়ী কেয়াংকে করিলে তুমি তীর্থস্থান।
হে মহাসাধক তোমার পদযুগলে আমাকে
ঠাঁই দিয়ে করো আশীর্বাদ।
তোমার পবিত্র পরশে ধন্য হোক জীবন
মৈত্রী, করুণা, ভাবনা, মুদিতা ঝরে পড়ুক
পুষ্প বৃষ্টির মতো,
তোমার স্নেহের এত মধুরতা, যেন স্বর্গীয় আভায়
জুড়ায় প্রাণ,
হে ধর্মবীর, হে কর্মবীর তুমি যে কত মহান
জানে তোমার ভক্তবৃন্দ॥
দূর থেকে নতশিরে তোমাকে করি বন্দনা,
ষড় রিপুকে করিতে জয় মধ্যম পন্থায় ছিল সাধনা,
'হে সাধনানন্দ' 'বনভন্তে' তোমার আয়ুরেখা লম্বা হোক
দেখিব তোমারে শতবারে, শতরূপে গেরুয়াবসনে
একটি রূপ।
জয়তু বুদ্ধ শাসনম এই হোক তোমার জয়গান,
মার্গ ফলে উঠিলে জাগিয়া বৌদ্ধ জাতি আর–
বুদ্ধের ধর্ম্মের সবাই মহিয়ান।
সবার এক সমান ॥

এ কবিতা বনভন্তের জীবনের আলোকে লেখা হয়েছে বিধায় অত্র জীবনী গ্রন্থে সংযোজন করলাম। –গ্রন্থকার